৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

আনন্দমেলা

ছোটদের সেরা রঙিন পূজাবার্ষিকী

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মতি নন্দী
বুদ্ধদেব গুহ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শৈলেন ঘোষ

সুকুমার সেনের
'পূজার পাঁচালি'

কবিতা ও ছড়া

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়,
বিষ্ণু দে, সুনির্মল বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়,
সন্তোষকুমার ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার,
আনন্দ বাগচী ও আরও অনেকে ।

গল্প

মনোজ বসু, বিমল মিত্র, প্রতুলচন্দ্র
গুপ্ত, লীলা মজুমদার, বিমল কর,
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,
সমরেশ মজুমদার,
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়,
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
অজেয় রায়,
তারাপদ রায়,
শিবশঙ্কর মিত্র,
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
ও আরও অনেকে ।

চিত্রকাহিনী 'ভুতুড়ে জুতো' ও
'হাঁসের ছানা মধুমালা'
পরীক্ষার্থীদের জন্য
'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়'
খেলাধুলা নিয়ে
রাজু মুখোপাধ্যায়ের লেখা
সেইসঙ্গে ধাঁধা, শব্দসন্ধান ও
আরও অজস্র আকর্ষণ ।

দাম ২৪ টাকা
রেজিস্টার্ড পোস্টে
২৭·৯০ টাকা

ফটো টাইপ সেটিং-এ অফসেট
পদ্ধতিতে ছাপা অনবদ্য
লেখায় ঠাসা পূজাবার্ষিকী ।

CLARION C-ABP-AM-2

আপনার কপির জন্য এখনই এজেন্টকে বলে রাখুন বা আমাদের লিখুন : সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০ ০০১ ।

আনন্দমেলা

২০ ভাদ্র ১৩৯১ ☐ ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ☐ ১০ বর্ষ ৫ সংখ্যা

গল্প
দেবতার ভর । সুকুমার সেন ৯
বাবার ছেলেবেলা । শৈবাল মিত্র ১৭
বন্ধু । শ্রীলতা চট্টোপাধ্যায় ৫৪
শেষ নাটকের গপ্পো । অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ৫৭
ইতিহাসের গল্প
ঘোড়ে পর্ হাওদা । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৩
উপন্যাস
পোড়োখনির প্রেতিনী (শেষাংশ) । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৬
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৫১
কবিতা ও ছড়া
রূপনারানে বান । শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৮
চাইছি ঘুড়ি, মাঞ্জাসুতো । শ্যামলকান্তি দাশ ৮
কেঁচে গণ্ডূষ । কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় ১৪
দুই লিমেরিক । রবিদাস সাহারায় ১৯
অঙ্ক-টঙ্ক । অশোককুমার মিত্র ১৯
শার্লক হোমসের গল্পমালা
বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ২৩
লেখাপড়া
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫
বাংলা বলো । বাচস্পতি ৭
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৭
মাধ্যমিকে প্রথম ও দ্বিতীয় । বাণীব্রত চক্রবর্তী ২৫
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৪৭
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০, টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৩২
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬১
খেলাধুলো
ওলিম্পিকে খেল খতম । অশোক রায় ৬৩
সুখে-দুঃখে ওলিম্পিক । সম্রাট রায় ৬৪
ইংল্যাণ্ড পাঁচটি টেস্টেই হারল । রাজা গুপ্ত ৬৫
মর্যাদার লড়াইয়ে মহমেডান জিতল । সুব্রত সিংহ ৬৬
অন্যান্য
ধাঁধা-মজা-শব্দসন্ধান ২৯
মজার খেলা, উত্তর বটে, হাসিখুশি ৩০
তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : সমীর মণ্ডল

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

ভাবনার কলকাতা

শরৎ এসে গেল । কলকাতার আকাশটাও নীল । সেখানে সাদা মেঘের ভেলা পাল তুলে ভেসে বেড়াচ্ছে । সকাল বেলার রোদ্দুরে সোনার ছোঁওয়া ।

জলে ডোবা কলকাতা, আবর্জনার কলকাতা, বস্তির কলকাতা শহরেও পূজোর আগমনী বাজছে । যতই নিন্দের হোক এ শহর, কলকাতাকে কলকাতার মানুষ প্রাণ দিয়ে ভালবাসে । শুধু কি কলকাতারই মানুষ ? পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব, হিমাচল, উত্তর-প্রদেশ, গুজরাত, রাজস্থান, দক্ষিণভারত, কাশ্মীর কোথাকার মানুষ নেই এখানে ? সকলেরই ভালবাসাধন্য এই কলকাতা শহর । একসাথে মিলেমিশে থাকার স্বভাব এটাই হল কলকাতার বৈশিষ্ট্য । "বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ।" আমরা সকলে ভিন্ন ভাষাভাষী হলেও আসলে একসুরে বাঁধা । সকলেই কলকাতাবাসী । আর ভারতবর্ষের ঐতিহ্যই হল এই ভালবাসা, এই সম্প্রীতি ।

প্রখর গ্রীষ্ম, প্রবল বর্ষণ এসবের পরে আমরা চাই কলকাতা শহরকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে । রাস্তাগুলো সারিয়ে বস্তিতে বিদ্যুতের আলো, পানীয় জল, পাকা রাস্তা ও স্যানিটারী পায়খানা তৈরী করে সেখানকার মানুষদের সমস্যাগুলোর কিছুটা সুরাহা করতে । জান তো কলকাতাবাসীর প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন হলেন বস্তিবাসী ? তার মানে নানা রকম জীবিকার মানুষ এই বস্তিতে বাস করেন । তাই বস্তিগুলিতে জীবনধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পৌঁছে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে । এ ছাড়াও চেষ্টা চলছে এই সব বস্তিতে এখনও যাঁরা বেকার তাঁদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করার । যার নাম স্ব-নির্ভর প্রকল্প । শরৎ আমাদের কাছে শিউলীর গন্ধ বয়ে এনেছে । এবারের বর্ষায় লাগান গাছগুলো ফুটপাথের ধারে ধারে পার্কের কোণে কোণে বড় হয়ে উঠছে । আর সেই সঙ্গে বড় হচ্ছ তোমরা, কলকাতার ভবিষ্যৎ নাগরিকরা । যাদের হাতে ভবিষ্যৎ কলকাতা উন্নয়নের চাবিকাঠি । আজকের কলকাতার সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করছি আমরা, বড়রা । তোমরা তোমাদের কলকাতাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা কর তো ?

(জনসংযোগ বিভাগ, সি· এম· ডি এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা ১৭ থেকে প্রচারিত)

"নিজের ওপর আমার নেই কোনো অধিকার"

"আমি হলাম, আমার পরিচালনরত থাকা সেই ছবিটির—আমার চিত্রণরত থাকা সেই চরিত্রটির—আমার লিখনরত থাকা সেই স্ক্রীপ্টটির— আমার দেখা মঞ্চের মেই নাটকটির—আমার প্রকৃত সেই বন্ধুটির—আমার ভেতরকার সেই স্বাধীনচেতা নারীটির-আর, সেই জিনিষটির, যা সবসময় আমার রঙরূপের পরিচর্যা করে, যার নামটি—লাক্স।"

শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স—চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

HLL-1146

লেখার চকে কী থাকে

চকও বলা যায়, আবার খড়িমাটিও বলতে পারি—যে চকে ছোটরা শ্লেট ভরায়, মাস্টারমশাইরা বোর্ডে লেখেন। এই চক জিনিসটা আসলে কী ?

রাসায়নিক দিক দিয়ে এটা হল ক্যালসিয়াম সালফেট। সাদা রঙের, জলে যে গুলে যায় না, তা তো দেখাই যায়।

এই যে চক যাতে লেখাপড়ার কাজ চলে তা কিন্তু প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না।

মারবেল, চুনাপাথরকেও চক বলা হয়। কিন্তু লেখার জন্যে যে চক, এরা সে-জাতের চক নয়। এরা হল ক্যালসিয়াম কারবোনেট। এই ক্যালসিয়াম কারবোনেট প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

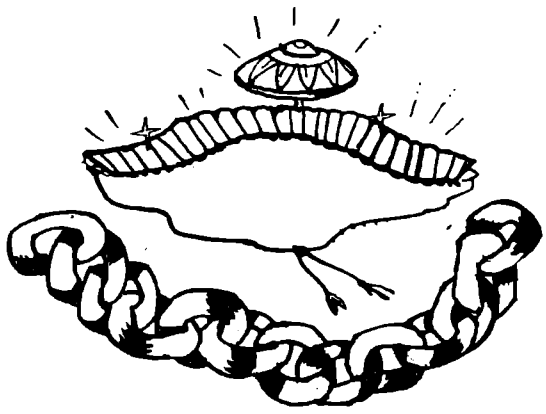

সোনা লোহার চেয়ে দামি কেন

খোলা জল-হাওয়ায় লোহার উপরে মরচে ধরে। এ এমন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এর জন্যে গবেষণাগারের মধ্যে যেতে হয় না। উত্তাপের দরকার পড়ে না। অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থও আনতে হয় না। সাধারণ অবস্থায় সাধারণ পরিবেশে খোলা হাওয়াতেই কাজ হয়। বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে বলে মরচে সেই সময়ে ধরে তাড়াতাড়ি।

এখানে বলে রাখা ভাল, ধাতু হিসেবে লোহার বিক্রিয়া-ক্ষমতা বেশি। শুধু লোহা নয়, আরও অনেক ধাতু আছে, সাধারণ বিক্রিয়াতেই যাদের অংশ নিতে দেখা যায়। কিন্তু সোনা এমন একটা ধাতু সাধারণ বিক্রিয়ায় যার কোনো ভূমিকা নেই। প্ল্যাটিনামও ওইরকম। সোনা সোনার মতোই থাকে, প্ল্যাটিনামও বদলায় না।

যে-সব ধাতু সাধারণ বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না, পরিবেশ-প্রভাবিত হয় না, তারা তো মূল্যবান হবেই। সোনা তাই মূল্যবান, প্ল্যাটিনামও।

গ্রীষ্মকালে কুকুর জিভ বের করে হাঁপায় কেন

গরমের দিনগুলিতে দেখা যায়, কুকুর জিভ বের করে হাঁপায়। দেখে মনে হয়, গরমে বড় কষ্ট হচ্ছে তার। হাঁপাতে গেলে এই যে জিভ বের করা, এর কি কোনো কারণ আছে ?

হ্যাঁ, জিভ বের করে হাঁপানোর নির্দিষ্ট একটা কারণ আছে। কুকুর যখন হাঁপায় তখন তার জিভ থেকে জল ঝরে। এই জল গরমে বাষ্প হয়ে যায়। আর বাষ্প হওয়ার সময়ে যে তাপের প্রয়োজন তা সে নেয় জিভ থেকে। ফলে উষ্ণতা কমে আসে। জিভে ঠাণ্ডা লাগে আর সেই জন্যে কুকুর কিছুটা আরাম পায়।

লেড পেনসিলে কি 'লেড' থাকে

লেড মানে সিসে। সিসে এক রকমের ধাতু। রঙ নীলাভ সাদা, চরিত্রে নরম আর নমনীয়। জলের পাইপ আর ছাপার টাইপে এর যথেষ্ট ব্যবহার। পেনসিলের শিষ বলতে আমরা যা বুঝি তা কি এই সিসে ?

না, পেনসিলকে লেড পেনসিল বললে কী হবে, পেনসিলের শিষ লেডে তৈরি নয়। পেনসিলের শিষ তৈরি হয় গ্র্যাফাইটে। এর আর এক নাম ব্ল্যাকলেড বা কালো সিসে। এই ব্ল্যাকলেডের লেডটুকু নিয়েই লেড পেনসিল কথাটা এসেছে।

পেনসিলের শিষের জন্য এই গ্র্যাফাইটেরই ব্যবহার হয়।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

সবচেয়ে কমদামে সবসেরা কোয়ালিটি

বিরাট অফ্ সীজন্ ছাড়

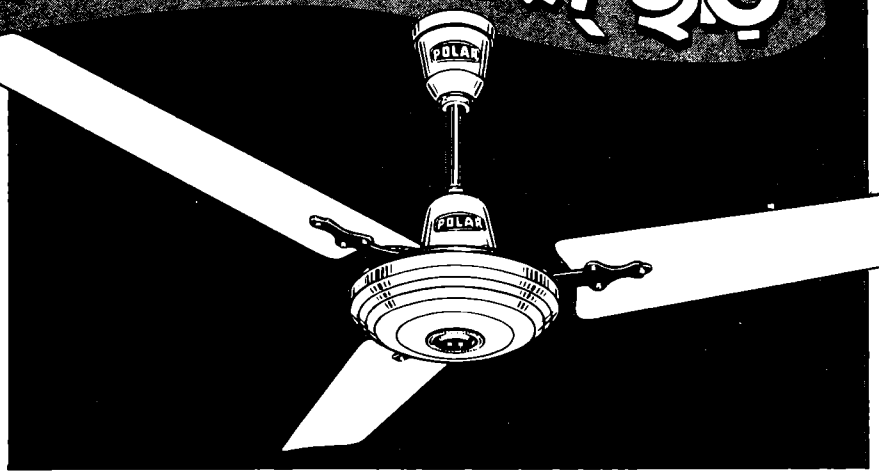

ঠিক তাই। এখনই পোলার পাখা কেনা সবচেয়ে লাভের কারণ বছরের কেবল এই মাসেই তা পাওয়া যায় সবচেয়ে কম দামে। এরপর প্রতিমাসেই দাম বাড়বে। সুতরাং আজই কিনুন — পোলার — আগামীকাল অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে।

পোলার

সুপার পাখা

আজ্ঞে হ্যাঁ

এ'টি ৭ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত

iaa 2448

বাংলা বলো

হাতে রইল চন্দ্রবিন্দু

"ত্রি-ফলা'র ম-ফলা বাকি রইল তাহলে।" ভণ্টুর বাবা বললেন ফাঁক পেয়ে।

"বাকি থাকতে দেব কেন?" হিগিনকাকু হুমকি দিলেন, "আমি যখন একবার ধরেছি তখন সব ব্যাটাকে শেষ না করে ছাড়ব ভেবেছ? এখন শোনো, ম-ফলার ব্যবহারও অনেকটা ব-ফলার মতো। সাধারণ ভাবে ম-ফলার ম উচ্চারণে থাকে না। শব্দের গোড়াকার যুক্তব্যঞ্জনে ম একদম বেপাত্তা। খুব 'শুদ্ধ' বা সচেতন উচ্চারণে সে একটা চন্দ্রবিন্দুর নাকীস্বর রেখে যায় মাত্র," বলে হিগিনকাকু একটা পুরোনো গান ধরলেন—

"শুধু সে রেখে গেছে চরণরেখা গো,
ছেঁড়া এ ছাতাখানি, বাঁশের ডাঁটা গো।

অর্থাৎ কিনা, এ গানটার প্রসঙ্গ-উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা হল—শব্দের গোড়ায় ম-ফলার ম সম্পূর্ণ উধাও—যোগফল শূন্য, হাতে রইল চন্দ্রবিন্দু। এই কথাগুলো শোনো— স্মরণ [শঁরোন], স্মৃতি [সঁৃতি], স্মার্ত [শাঁর্তো], স্মিত [শিঁতো]। শেষ দুটো কথায় আজকাল বানান দেখে অনেকে 'স্মার্তো' আর 'স্মিতো' বলে, ম-ফলা উচ্চারণ করে। পুরনো উচ্চারণ আমি যা বললাম তাই।"

"আর শব্দের গোড়ায় যদি ম-ফলা না থাকে, অন্য জায়গায় থাকে?" ভণ্টু জিজ্ঞেস করল। সে বুঝে গেছে শব্দের গোড়ায়, না গোড়ায় নয়—এ কথাটা খুব জরুরি।

"গোড়ায় না থাকলে ঐ য-ফলা ব-ফলার মতোই ব্যঞ্জনটাকে ডবল করে বিদায় নিচ্ছে— যেমন 'বিস্মরণ' [বিশ্‌শঁরোন], 'বিস্ময়' [বিশ-শঁয়], 'আত্মা' [আঁত্তা], 'পদ্ম' [পদ্দোঁ], 'লক্ষ্মী' [লোক্‌খি], 'রুক্মিণী' [রুক্‌কিনি]। লক্ষ করো, সব জায়গায় চন্দ্রবিন্দু লাগছে না। মুখের কথায় লোকে অত খেয়াল করে না।"

বাবা স্লোগান দিলেন, "আমাদের দাবি মানতে হবে, ব্যতিক্রমের কথা বলতে হবে।"

"ব্যতিক্রম সবই শব্দের মাঝখানে। সেখানে যেখানে ম উচ্চারণ হচ্ছে সেটাই ব্যতিক্রম। যেমন সুস্মিতা [শুশ্‌মিতা], শুচিস্মিতা [শুচিশ্‌মিতা— কেউ কেউ শুচিশ্‌-শিতাও বলে, আবার কেউ 'স্মিত'-কে ম-ফলা দিয়ে উচ্চারণ করে], 'কাশ্মির', 'গুল্ম', 'বাগ্মী' [কেউ কেউ পুরনো ধরনে 'বাগ্‌-গিঁ'ও বলে], 'যুগ্ম' [জুগ্‌মো]। এর কিছু শব্দে বানানের চোখ-রাঙানিতে ঘাবড়ে গিয়ে আমরা 'ম' বলতে শুরু করেছি।" বলে হিগিনকাকু বললেন, "রান্নাঘরের দিকটা এত নিঃশব্দ কেন?"

বাচস্পতি

সহজে ইংরেজি

চম্বল বড় হয়েছে

অনেক দিন পরে এ-বছর আবার পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া হবে। তার যোগাড়-যন্তর এখন থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এবারে কিন্তু সেই যোগাড়-যন্তরের ভার অনেকটাই পড়েছে চম্বলের ওপর।

Milly has never seen her brother looking so important.

He sits for his school-leaving examination next year.

He should be at least half-an inch taller by then.

"Quite tall enough," Mother thinks.

কিন্তু শুধু লম্বা হলেই তো হবে না, বড় হতে হবে। বড়-বড় কাজের ভার নিতে হবে।

"Listen," Daddy told him, "this is what you do. You look up the trains in the time-table. Find out which train suits us best. Of course, you'll consult Mummy and me about your choice."

"When do we start, Daddy?"

"Well, let us see. When does your school close for the Puja holidays?"

"I don't know. I'll look up the calendar."

"And what about Milly's school? When do your Puja holidays start this year, Milly?"

এ-সব কথাবার্তার পর রওনা হবার তারিখ ঠিক করা গেল। তারপর ট্রেন ঠিক করা, আর টিকিট কাটার পালা। কে কাটবে? আবার কে? চম্বল।

"You'd better get there early in the morning, Chambal. The booking-office is open round-the-clock. The earlier you get there in the morning, the shorter you'll find the queue," Daddy says.

"Now, where can I find a time-table?" Chambal wonders. "Have we got one in the house?"

As it happened, there was a time-table in the house.

ট্রেন ঠিক হল, টিকিট কাটা হল। যে হোটেলে গিয়ে ওঠা হবে সেখানে ঘর রিজার্ভ করা হল। এবারে বাকি শুধু দিন গোনা

"Our train doesn't start till late in the evening," Daddy said. "Very convenient. We'll have our dinner and start for the station with plenty of time in hand."

"When do we arrive, Daddy?" Milly asked.

"Just a minute. I'll tell you." said Chambal, and started turning the pages of the time-table.

এবার নীচের বাক্যগুলো লক্ষ করো। যদিও ক্রিয়াপদের রূপ বর্তমান কালের, আসলে ভবিষ্যৎ-কালের কথা বলা হচ্ছে। এই ব্যবহারটা ইংরেজিতে খুব চলে।

He sits for his examination next year.
When do we start?
When does your school close?
When do your holidays start?
When do we arrive?

ক্রিয়াপদের ব্যবহারের এই রকম আরও কয়েকটি গোলমেলে ব্যাপার এর পরে দেখাব।

প্রসাদ

রূপনারানে বান

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর
রূপনারানে বান
তাই দেখতে তাতারবাবু
কোলাঘাটে যান।
কোলাঘাটে গেলেন তাতার
মোটরলঞ্চে চেপে,
তাই না দেখে রূপনারানের
জল গিয়েছে খেপে।

জল গিয়েছে খেপে রে ভাই
উথালপাথাল করে,
ইলিশমারির নৌকো নেই যে
জোড়া-ইলিশ ধরে!
ইলিশ না হয় না-ই হল ভাই
জল যে ভয়ংকর,
রূপনারানের এ-রূপ দেখে
তাতার চলেন ঘর।

চাইছি ঘুড়ি, মাঞ্জাসুতো

শ্যামলকান্তি দাশ

বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে,
বুঝলে কিনা খোকনমামা—
চাই না ভেঁপু ভ্যাঁপোর প্যাঁপোর
চাই না সবুজ-হলদে জামা।
চাই না লজেঞ্চুস বা টফি
চাই না মোজা, চাই না জুতো,
চাইছি আমি লাটাই, এবং
মাঞ্জা-দেওয়া রঙিন সুতো।
যাচ্ছ নাকি আনতে কিছু?
খই-বাতাসা, মুড়কি-মুড়ি?
আমার জন্যে আনবে কিন্তু
একটি ময়ূরপঙ্খি ঘুড়ি।
ময়ূরপঙ্খি যদি না পাও
চাঁদিয়ালও আনতে পারো,
চৌখুপি-পেটকাট্টি পেলে
কয়েকখানা আনবে তারও।
আসুক মুনু, আসুক পাপান,
আসুক না ওই মৃগেনদাদু—
হুঁহুব্বাবা, বাবুই জানে
প্যাঁচ লাগাবার হরেক জাদু।

ছবি : অনুপ রায়

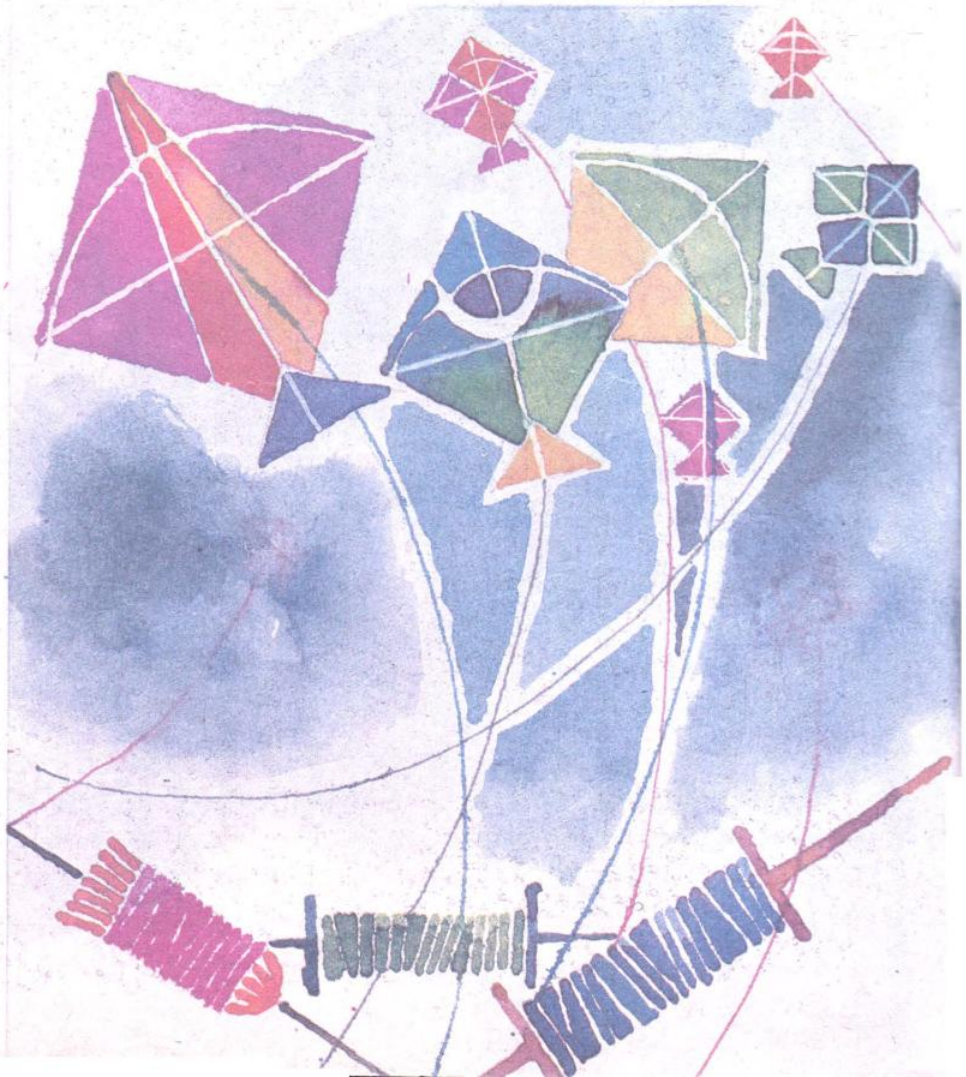

দেবতার ভর

সুকুমার সেন

ভূত-চতুর্দশীর সন্ধ্যা। মহাকালের মন্দিরাধ্যক্ষের আবাসে কালিদাস ও কয়েকজন বন্ধুর আগমন হয়েছে। তার মধ্যে ধন্বন্তরিও আছেন।

কথায়-কথায় সেদিন ধন্বন্তরির বাড়িতে তাঁর অদ্ভুত ভূতের গল্পের আসরের কথা উঠল। কথায় কথায় ঘটকর্পর কালিদাসকে অনুরোধ করলেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিচিত্র ও অদ্ভুত ভূতের কথা শোনাতে। এ-প্রস্তাবে সকলেই মেতে উঠে সায় দিলেন।

বিব্রত বোধ করে কালিদাস বললেন, "সব কাহিনী মনে নেই। যে-সব কাহিনী মনে আছে, তা সব বলা যায় না, কেননা পাত্রপাত্রীকে অনেকেই চিনতে পারেন।"

বরাহমিহির বললেন, "নাম বদল করে বলুন।"

"বছর পঁচিশ-তিরিশ আগেকার কথা। উজ্জয়িনী থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে একটি পুরনো নামজাদা গ্রাম। সে গ্রামের প্রধান অধিবাসী ছিলেন ধরুন 'দিবাকর চন্দ্র'। এঁর পূর্বপুরুষ গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং তা কতদিন আগে, তা কেউ বলতে পারে না। এঁরা শুধু ধনী ছিলেন না, পণ্ডিতও ছিলেন, মেয়ে পুরুষ। এঁরা উপাসনা করতেন বিষ্ণুর অথবা শিবের নয়, গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর। ঋগ্‌বেদ থেকে জানা যায় যে, গন্ধর্ব বিশ্বাবসু কোনো-কোনো সমাজে বিষ্ণুর মতো পূজিত হতেন। দিবাকর চন্দ্রদের বংশ বাড়েনি। তবে এ-বংশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথাসম্ভব বজায় রেখে এসেছে। দিবাকরের সংসার ছোট। সে, স্ত্রী, তরুণ পুত্র, আর তরুণতর পুত্রবধূ।

"পুত্র রাজ-কর্মচারী, সে বাইরে আছে। এক বছর অন্তর ছুটি পায় চার মাস—আষাঢ় থেকে আশ্বিন। তখন সে বাড়ি আসে। এ-বছর ছুটি নিলে না। সামনের আষাঢ়ে সে বাড়ি আসবে। ইতিমধ্যে বধূমাতা যে কাণ্ড বাধিয়েছে, তাতে দিবাকরের হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে।

"দিবাকরের সঙ্গে একদা মহামন্ত্রীর খুব হৃদ্যতা ছিল। তখন তিনি ঘন-ঘন উজ্জয়িনীতে আসতেন ছেলের তদারকি করতে। এখন আর বেশি আসেন না, তাই মহামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ শিথিল হয়ে গেছে। এখন মহাবিপদে পড়ে তিনি মহামন্ত্রীর কাছে ছুটে এসেছেন। কাকার বন্ধু দিবাকর যে বিবরণ দিয়েছিলেন তা বলছি।

"ওঁদের বাড়ি ছিল সেকালের বড়লোকদের যেমন হয়।

পাঁচিল-ঘেরা বিরাট বেড়। ভিতরে গোশালায় গোয়ালঘর, উঠোন, দু' মহল, একতলা ইট ও পাথরের ঘর। পুবদিকে সিং-দরজা। বেরিয়েই একটু খোলা জায়গা। তারপর রাজপথ। তারপর বিরাট দিঘি। হ্রদের মতো। পশ্চিমে খিড়কি দরজা। খুললেই চমৎকার একটি বাগান ও ছোট পুকুর। পুকুরের বাঁধানো পাড়ের ধারে সযত্নে রোপিত ও রক্ষিত চমৎকার বিদেশী বাঁশের ঝাড়। তার চারদিক পাথরে বাঁধানো, বিষ্ণুমন্দিরে তুলসীমঞ্চের মতো। প্রাচুর্যের সংসার। যথেষ্ট দাসদাসী।

"এইবার ঘটনায় আসি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উতরে গেছে, কিন্তু বউমা এখনও ঘাট থেকে ফেরেনি দেখে গিন্নি উদ্বিগ্ন হয়ে খিড়কি-ঘাটে গেলেন। গিয়ে দেখেন, বধূমাতা বাঁশঝাড়-মঞ্চের কাছে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রয়েছে। বিস্মিত হয়ে কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'বউমা, এ কী কাণ্ড! তুমি এমন করে এখানে বসে রয়েছ কেন? কী হয়েছে?'

"মেয়েটি বললে, 'বেশ ভাল লাগছিল বলে বসে আছি।'

"কথা শুনে গিন্নি চমকে উঠলেন। এ তো বউমার কণ্ঠ নয়, এ তো পুরুষালি গলা। আর এমনভাবে বৌমা তো কখনও তাঁর সঙ্গে কথা কয়নি। গিন্নির ভয় হল; আস্তে-আস্তে বললেন, 'চলো মা, ঘরে চলো।'

"এই কথা শুনেই বউ উঠে পড়ল, তারপর গিন্নির আগে-আগে বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। তারপর তাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ দেখা গেল। গিন্নির মন কিছু ঠাণ্ডা হল। ভাবলেন, আমারই শোনার দোষ হয়ে থাকবে। বউমার কিছু হয়নি। স্বামীকে এ-বিষয়ে তিনি কোনো কথা বললেন না।

"পরের দিন সকালে বধূমাতা ঘুম থেকে উঠেই শাশুড়িকে বললে (এবং পুরুষালি কণ্ঠে), 'দাসী গোয়ালঘর না কেড়েই উঠোন ঝাঁট দিয়েছে। আপনাকে জানালুম।'

"বিস্মিত হয়ে শাশুড়ি বললেন, 'সে কী রকম? তুমি তা জানলেই বা কী করে?' উত্তর না দিয়ে বধূমাতা সেখান থেকে চলে গেল। গিন্নির বুক দুরুদুরু করতে লাগল। তিনি বাইরে গিয়ে দেখলেন উঠোন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। তারপর গোয়ালে ঢুকে দেখলেন, তা পরিষ্কার করা হয়নি। দুরুদুরু বুকে গিন্নি গিয়ে কর্তাকে একথা জানালেন। কর্তা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'স্বপ্ন দেখেছে। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়।' তখন গিন্নি আগের দিন সন্ধ্যার ঘটনা বললে পর কর্তা শুনে একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, 'দেখা যাক, আর কিছু ঘটে কিনা। এইটুকুতে অস্থির হবার কিছু নেই।'

"তার পরে এমন একটি ছোট ঘটনা হল, যাতে বাড়ির দিবাকর চন্দ্র ছেলেমানুষ পুত্রবধূর মধ্যে পুরুষ-নারী দ্বন্দ্ব-ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব স্বীকার না করে পারলেন না। ঘটনাটি হল এই—একদিন বউমা সকালবেলাতেই শাশুড়িকে জানিয়ে দিলে যে, দু'চার দিনের মধ্যে তাদের রাঁধুনি দেশে যেতে চাইবে। তাকে যদি ছুটি দেওয়া হয়, তবে তার তল্পিতল্পা সব যেন যাবার সময় খুঁটিয়ে দেখা হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বউ বললে যে, সে আজকাল মশলাপাতি চুরি করছে।

"দু-দিন পরে রাঁধুনি সত্যিই বললে, তার বাড়ি থেকে খবর এসেছে, তাকে যেতে হবে। দশ-বারো দিন ছুটি চাই। ছুটি দেওয়া হল। যাবার সময় তার জিনিসপত্র তল্লাসি করা হল। চোরাই মাল পাওয়া গেল। তা কিন্তু তাকেই দিয়ে দেওয়া হল।

"এই ব্যাপারে দিবাকর বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি রোজা ডাকাবার কথা ভাবলেন। বধূমাতা তাঁর মনের ভাব বুঝে বললেন, 'রোজা-টোজা ডাকবেন না। যেমন চলছে চলুক।'

"দিবাকর শুনলেন না, রোজা ডাকালেন। রোজা এসে বাইরের ঘরে মণ্ডলচক্র এঁকে নানারকম তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান করতে লাগল। শেষে বধূমাতাকে আনাল। বধূমাতা ঘরে এসে দেখল যে, রোজা আগুনে হলুদ পোড়াচ্ছে। সে তা দেখে এক লাফে রোজার কাছে গিয়ে মারল তার গালে এক চড়। রোজা মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল। বধূমাতা ভিতরে চলে গেল। মূর্ছাভঙ্গ হলে পর রোজা বিনা বাক্যব্যয়ে জিনিসপত্র গুটিয়ে চলে গেল।

"দিবাকর এখন মহা ভাবনায় পড়লেন। কী করেন, কোথায় যান। তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাঁর এক যৌবন-সুহৃদের কথা। মহামন্ত্রী শারদানন্দের সঙ্গে একদা তাঁর খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। এখন মনে হল শারদানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করা যাক। তখুনি তিনি চিঠি লিখতে বসলেন শারদানন্দকে।

'ভাই আনন্দ, ভারী মুশকিলে পড়েছি। লিখে জানানো যায় না। এক্ষুনি তোমার কাছে যেতে চাই। কখন যাব তা পত্রপাঠ জানাও। ইতি, তোমার বিগত দিনের বান্ধব আকর।'

"চিঠি লিখে দিবাকর তাঁর গোমস্তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই চিঠি নিয়ে পালকি করে এখুনি উজ্জয়িনীতে যাও। গিয়ে মহামন্ত্রীর হাতে দাও এই চিঠি। তাঁর উত্তর নিয়ে আসবে। যতক্ষণ তিনি উত্তর না দেন, ততক্ষণ তাঁর কাছ ছাড়বে না। কাল বিকেলের মধ্যে ফেরা চাই।'

"চিঠি নিয়ে গোমস্তা উজ্জয়িনী দৌড়ল। পরের দিন সন্ধ্যার আগেই শারদানন্দের উত্তর এল, 'আকর, এখুনি চলে এসো।— আনন্দ।'

"তার পরের দিন দুপুরের খানিকক্ষণ পরে আমার জরুরি ডাক এল মহামন্ত্রীর আপিস থেকে। আমি গিয়ে দেখলুম তিনি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন। দুজনের মুখেই চিন্তার ছাপ। আমাকে দেখে কাকাবাবু হাঁফ ছেড়ে বলে উঠলেন, 'এই তো কালিদাস এসে পড়েছে।' তারপর আমার সঙ্গে দিবাকর চন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর পুত্রবধূর সব কাহিনী আমাকে বললেন। যে-কথা আমি এতক্ষণ বললুম।

"তারপর শারদানন্দ বললেন, 'কালিদাস, তোমাকে তো এর বিহিত করতে হয়। এমন কাণ্ড তো কখনো শুনিনি।'

"আমি বললুম, 'শোনেননি, সে-কথা ঠিক। কিন্তু পড়েছেন। ভাল বইয়েই পড়েছেন। আপনার মনে নেই। সে-কথা পরে বলব। মনে হচ্ছে প্রতিকার সম্ভব, এবং তা আমি করতে পারব। তবে আমাকে অকুস্থলে যেতে হবে।'

"দিবাকর চন্দ্র লাফিয়ে উঠে বললেন, 'এখুনি চলুন। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।'

"আমি বললুম, 'আমার একটু প্রস্তুতি দরকার। তাই আমি তো এক্ষুনি যেতে পারব না। তবে আপনি যদি রাত্রিতে এখানে থেকে যান, তো কাল সকালে দুজনে একসঙ্গে যেতে পারি।'

"দিবাকর চন্দ্র তাতেই রাজি ছিলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধু তাঁকে থাকতে দিলেন না। বললেন, 'তোমার গিন্নি একলা আছে। অযথা তাঁকে রাত্রিকালের সংশয়-আতঙ্কে ফেলে রেখো না। কালিদাস কাল সকালেই যাত্রা করবে। ওর কথায় ভরসা করতে পারো।'

"দিবাকর চন্দ্র বললেন, 'তোমরাই তো আমার একমাত্র ভরসা।' সন্ধ্যা পড়বার আগেই দিবাকর চন্দ্র বাড়িমুখো হলেন।

"দিবাকর চন্দ্র চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে মহামন্ত্রী আমাকে বললেন, 'কী বইয়ের কথা বলছিলে তুমি?'

"আমি বললুম, 'বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা। যাতে যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনী আছে—এক গন্ধর্ব-গৃহীত নারীর কাছে অধ্যাত্ম-উপদেশ শোনা।'

"'ওঃ হো। ঠিক বলেছ। এ-মেয়েটি তাহলে গন্ধর্ব-গৃহীত?' শারদানন্দ বললেন।

"'তাই তো মনে হচ্ছে,' আমি বললুম।

"'ছাড়াতে পারবে তুমি?'

"'আমার মনে হচ্ছে আপনার যৌবনসুহৃদ মহাশয়েরা কুলক্রমে গন্ধর্ব-উপাসক। তা যদি হয়, আমি ছাড়াতে পারব। নইলে কী হবে বলতে পারছি না।'

"'তুমি ঠিকই ধরেছ। ওর দেবতা শিব বা বিষ্ণু নন, তাঁর অন্য নাম। নামটা মনে পড়ছে না।'

"'বিশ্বাবসু কি?'

"'হাঁ হাঁ, তাই হবে।'

"'তা যদি হয়, কোনো ভয় নেই।'"

এ-গল্পের বাকিটুকু এবারে বলি। পরের দিন সকালে কালিদাসের বেরুতে একটু দেরি হয়ে গেল। তাঁকে একটি পুঁথি নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে, সেটি খুঁজতে সময় লেগে গেল। কালিদাস যখন দিবাকর চন্দ্রের গ্রামে পৌঁছলেন, তখন দুপুর অনেকক্ষণ গড়িয়ে গেছে। কালিদাস স্নান করে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু দুপুরের খাওয়া হয়নি। দিবাকরের বাড়ি পৌঁছে দেখলেন যে, অতিথির অনাগমনে সকলেই অভুক্ত রয়েছেন। কালিদাস খুব লজ্জায় পড়লেন। বলতে লাগলেন, "আপনাদের অভুক্ত রেখে বড় অন্যায় করেছি।"

খাওয়া-দাওয়ার পর কালিদাস দিবাকরকে বললেন, "আপনার বাড়িটি সব দেখব।" দিবাকর দেখালেন। প্রথমেই গেলেন দেবমন্দিরে। সেখানে দেখলেন বিশ্বাবসু দেবপ্রতিমা—একটি সোনার গাছ, তার একডালে বসে আছে অমৃতভাণ্ড নিয়ে সুবর্ণ (পাখি)। তারপর সব ঘরটর ঘুরে গেলেন খিড়কিতে। বাগানে সেই বংশমঞ্চের কাছে গিয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে বললেন, "বউমাকে ডাকুন। তাঁকে দেখি।"

বউমা এল। বিনীতভাবে কালিদাসকে নমস্কার করে একধারে নির্দিষ্ট আসনে বসল। কালিদাসও তাকে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। তারপর দুজনে পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। দণ্ডখানেক এইরকম তাকিয়ে থাকবার পর বউমার চোখ নরম হয়ে নেমে পড়ল। কালিদাস স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, "বউমা, তোমাকে একটি পুরনো গল্প পড়ে শোনাব। মন দিয়ে শোনো।" বউমা

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল।

যে-পুঁথিটি কালিদাস সঙ্গে করে এনেছিলেন, তা খুলে পড়তে লাগলেন। শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মকথা। যেটুকু বউমার কাছে পড়েছিলেন, তা এখানে অনুবাদ করে দিই।

"ভুজ্যু লাহ্যায়নির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'তোমার হয়তো মনে আছে, একদা যখন আমরা শিক্ষার্থী অবস্থায় পরিব্রাজক হয়ে এখানে-ওখানে এর-ওর কাছে গিয়ে নতুন-নতুন বিদ্যা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলুম, তখন পতঞ্চল কাপ্যর ঘরে কিছুদিন থাকি। সেখানে তাঁর স্ত্রী ছিল গন্ধর্ব-গৃহীত। তাঁর মুখে অনেক ভাল-ভাল তত্ত্বকথা শুনেছিলুম। নিশ্চয়ই সেসব তোমার মনে আছে?"

এই পর্যন্ত শুনেই বধূমাতা কাত হয়ে ঢলে পড়ল। সকলে ব্যস্ত হয়ে তাকে ধরতে গেল। কালিদাস নিষেধ করলেন। অল্পক্ষণ পরেই বধূমাতার চেতনা হল। লজ্জিত হয়ে সে গায়ের কাপড় টেনেটুনে ঠিক করে কালিদাসের কাছে গিয়ে তাঁর পদস্পর্শ করে প্রণাম করলে। কালিদাস মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর দিবাকর চন্দ্রকে বললেন, "আর কোনো ভয় নেই।"

মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেল। গোরুবাছুর গাছপালা পর্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

বিদায় নেবার আগে কালিদাস দিবাকর চন্দ্রকে বললেন, "আপনার ছেলের বাড়ি আসতে যদি দেরি থাকে, তবে এক-আধমাসের জন্যে বউমাকে বাপের বাড়ি থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারেন। নইলে সকলে মিলে দু'চার মাস উজ্জয়িনীতে কাটাতে পারেন।"

"আপনি যা বলেন," দিবাকর উত্তর দিলেন।

কালিদাসের গল্প শুনে সকলে চুপ করে রইল।

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্তন
আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন...

নেস্টাম: সহজতর পরিবর্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেই জন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান —যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

যখন তার বয়স প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে অন্যান্য যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল সহজ পাচ্য।

দুধের সঙ্গে প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যে পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমতা বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন:

নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008

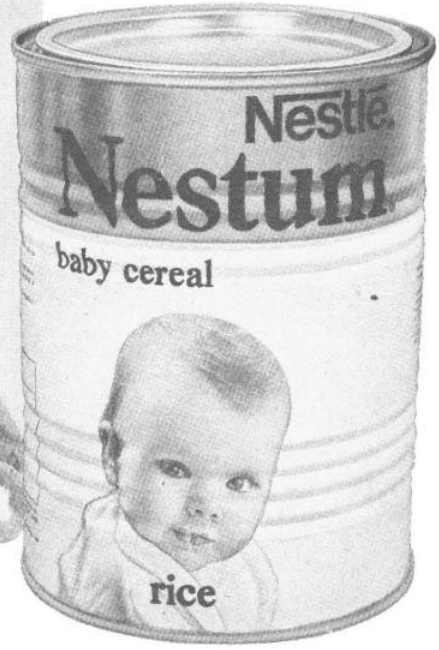

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

নেস্টাম
বেবি সিরিয়্যাল

দুধের সঙ্গে মেশান

তৈরী করা খুব সোজা।

আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন।

নেস্টাম মিশিয়ে নিন।

এবার খেতে দিন।

NESTLÉ

SAA/FSL/N 3150 BEN

SAA/FSL/N/3150 BEN

ঘোড়েপর্ হাওদা

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

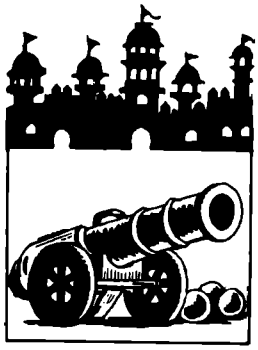

কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাট সবার জানা। গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডানদিকে বাঙালিটোলার সরু গলি। গলির মুখ থেকে অল্প হাঁটলেই চৈত সিংয়ের প্রাসাদ। বাড়ির পিছন দিক থেকেও আসা যায়। তখন নৌকা ভরসা। ইংরাজ সৈন্যরা আক্রমণ করলে রাজা চৈত সিং নৌকা করে পালিয়েছিলেন। কী করে তাঁর এরকম বিপদ হল সেই কথা বলছি।

চৈত সিংয়ের ঠাকুর্দার নাম ছিল মনসারাম। ইনি অনেক টাকা জমিয়েছিলেন ও জমি-জমাও করেছিলেন। তিনি ছিলেন জমিদার, তাঁর ছেলে বলবন্ত সিংকে সবাই রাজা বলত। তাঁর জমিদারি তাঁর বাবার চেয়ে অনেক বড় ছিল। তিনি অযোধ্যা নবাবের অধীন ছিলেন। ১৭৭৫ সালে প্রভু বদল হল। সন্ধির ফলে চৈত সিংয়ের জমিদারি ইংরাজদের অধীনে চলে এল। ঠিক হল চৈত সিং এখন থেকে কর জমা দেবেন পাটনায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির খাতাঞ্চি-খানায়। করের পরিমাণ ২২, ৫০, ০০০ টাকার কাছাকাছি। ঠিক হল চৈত সিংয়ের জমিদারিতে কোম্পানি কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। কোম্পানির পক্ষ থেকে আরও বলা হল চৈত সিং দু-হাজার অশ্বারোহী রাখবেন। সেটা তাঁর ইচ্ছা হলে তবে। তিনি রাখতে বাধ্য নন। চৈত সিং অশ্বারোহী রাখবেন বলে কোনো অঙ্গীকারও করেননি। কোম্পানির যদি এই অশ্বারোহীর সাহায্যের দরকার হয় তাহলে তার জন্য চৈত সিংকে খরচপত্রের টাকা দেওয়া হবে। এই অশ্বারোহীর দল রাখা না রাখা চৈত সিং-এর মর্জির উপর নির্ভর করবে। এজন্য ইংরাজরা কোনোরকম জোর করবেন না।

১৭৭২ সালে হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেল হলেন। তখন কোম্পানির টাকা-পয়সার টানাটানি। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে অনেক টাকা খরচ হল। ১৭৭৮ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় খবর এসে পৌঁছল যে, ইউরোপে ফরাসিদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধ হলেই টাকার খুব দরকার হয়। চৈত সিংকে বলা হল যে যুদ্ধের খরচ মেটাবার জন্য তাঁর কিছু করা উচিত। সেইজন্য তাঁকে তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্যের খরচ দিতে হবে। এক ব্যাটেলিয়ানে হাজার লোকের কিছু কম থাকে। কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান একসঙ্গে করে ব্রিগেড তৈরি হয়। ব্রিগেডে হাজার-দশেক সৈন্য থাকে। চৈত সিং দেখলেন তাঁর উপর অনেক টাকার দায়িত্ব এল। তিনি ইংরাজদের বললেন : এত খরচ করা তাঁর সাধ্যের বাইরে। আরও টাকা দেবার কথা হয়েছিল। চৈত সিং-এর দূত জানালেন : অসম্ভব। শেষে ইংরাজের ধমক খেয়ে দূত স্বীকার করলেন, তাঁর মনিব পাঁচ লাখ টাকা দিতে রাজি আছেন। কিন্তু এই অঙ্গীকার শুধু এক বছরের জন্য। হেস্টিংস বললেন, তা হবে না। যতদিন ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ চলবে ততদিন বছরে পাঁচ লাখ টাকা চাই।

হেস্টিংসের ধারণা হল যে, চৈত সিং গোলমাল করবার চেষ্টায় আছেন। কোম্পানির সৈন্যদের চৈত সিংয়ের রাজ্যের মধ্যে ঢুকবার হুকুম দেওয়া হল। এতে কোম্পানির যে বাড়তি খরচ হবে, হেস্টিংস জানালেন—তাও চৈত সিংকে দিতে হবে।

বছর-দুয়েক এরকম ভাবে চলল। চৈত সিং তারপর হেস্টিংসকে জানালেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তার জন্য তিনি অনুতপ্ত। সেই সঙ্গে হেস্টিংসকে দু-লাখ টাকা পাঠালেন। এটা ঘুষ। তখনকার দিনে বড়-বড় সাহেবদের এরকম ঘুষ দেওয়া অজানা ছিল না। হেস্টিংস একটু ইতস্তত করে টাকাটা নিলেন। কিন্তু এই টাকা নিজের তহবিলে জমা করলেন না। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে খরচ করবার জন্যে তুলে রাখলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চৈত সিংয়ের কাছে জানতে চাইলেন —আরও টাকা তাঁর দেবার কথা ছিল, তার কী হল ? দু-হাজার অশ্বারোহী রাখবার কথা ছিল, তার কী ব্যবস্থা হয়েছে ? আগেই বলেছি, দু-হাজার অশ্বারোহী যে রাখতেই হবে এমন কোনো কথা হয়নি।

ইংরাজরা দু-হাজার অশ্বারোহী থেকে আস্তে-আস্তে দেড় হাজারে নামলেন, তারপর এক হাজারে। চৈত সিং বললেন, এক হাজার অশ্বারোহীর মাইনে দেবার মতো টাকাও তাঁর নেই। তার বদলে তিনি পাঁচশো অশ্বারোহীর একটি দল তৈরি করলেন আর পাঁচশো পদাতিক যোগাড় করলেন। তারপর হেস্টিংসকে খবর দিলেন। হেস্টিংস চৈত সিংয়ের এই চিঠির উত্তর দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করলেন না—বরং ভাবলেন যে, চৈত সিংকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। গভর্নর-জেনারেলের কথা না শুনবার ফল কী হতে পারে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

১৭৮১ সালের জুলাই মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস বক্সারে এসে পৌঁছলেন। বক্সার চৈত সিংয়ের জমিদারির পূর্ব-সীমান্ত। অলিখিত নিয়ম হচ্ছে যে, সীমান্তে এরকম গণ্যমান্য অতিথি এলে সেই জায়গায় গিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা করতে হয়। চৈত সিং বক্সারে এলেন। সঙ্গে একটি বড় নৌবাহিনী এল, তার নাবিক ও সৈন্যদের সংখ্যা দু-হাজার হবে। এত লোকজন নিয়ে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে আসা উচিত হয়নি। হেস্টিংসের মেজাজ আরও খারাপ হল। চৈত সিং এইবার ভয় পেলেন। তিনি তাঁর পাগড়ি মাথা থেকে খুলে হেস্টিংসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পাগড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার অর্থ বশ্যতা স্বীকার করা। হেস্টিংসের তখন এত রাগ হয়েছিল যে, তিনি সেই পাগড়ি গ্রহণ করলেন না। সোজা বারাণসী রওনা হয়ে গেলেন। সেখানেও হেস্টিংস চৈত সিংকে তাঁর সামনে আসতে দিলেন না—তাঁর কাছে কোম্পানির কী-কী দাবি লিখে জানালেন। চিঠিতে এমন কথাও ছিল যে চৈত সিং রাজ্যশাসন করবার অনুপযুক্ত। রাজ্যে চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে।

চৈত সিং খুব বিনীত উত্তর দিলেন। বললেন, তাঁর শত্রুরা তাঁর যাতে সর্বনাশ হয় এমন কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। চিঠি শেষে ছিল—'আমি আপনার দাস আপনার দিন-দিন

কেঁচে গণ্ডূষ

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

যতীশচন্দ্র বাগড়ি—
চড়ল মাথায় পাগড়ি ;
কেমন করে বইবে সে আর
পয়রা গুড়ের নাগরি ?
তাই সে হল চাক্‌রে
কান ধরে, ঠ্যাং পাকড়ে।
নব্য কেতায় ছাঁট চালিয়ে
বনল জে· সি· বাক্‌রে।

লাভ থাকে না কিচ্ছু ;
বস্‌-টি খাঁটি বিচ্ছু।
কাঁকড়িদানার ব্যবসাতে ফের
খায় সে এখন রাবড়ি।
নব্য কেতার নামের সে ছাঁট
ফের হয়েছে বাবরি।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

শ্রীবৃদ্ধি হোক।'

এই চিঠি পেয়েও হেস্টিংসের রাগ কমল না। পরে তিনি তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের বলেছিলেন : চিঠির ভাষা দেখলেন আপনারা ? এ তো নিজের সাফাই নয়, আমার বিরুদ্ধে কথা। কাশীর রেসিডেন্ট উইলিয়াম মার্কাম্‌কে হুকুম দিলেন, তিনি যেন পরদিন ভোরে সৈন্য নিয়ে চৈত সিংকে গ্রেপ্তার করেন। চৈত সিং যদি কোনোরকম বাধা দিতে চান তাহলে যেন মেজর পপামের সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাজাকে গ্রেফতার করা হলে পরবর্তী হুকুম না আসা পর্যন্ত মার্কাম যেন তাঁকে নিজের কাছে বন্দী করে রেখে দেন। চৈত সিং কোনো বাধা দেননি। বন্দী হবার পর হেস্টিংসকে একটি চিঠি লিখলেন। তার একটি অংশ এইরকম : আমি তো পূর্বেই আপনার নৌকায় উঠে বলেছিলাম যে, আমি কোম্পানির সেবক। মন-প্রাণ দিয়ে কোম্পানির সেবা করব। আমাকে যা করতে ইচ্ছা হয় আপনি নিজের হাতে করুন। আমি আপনার দাস। সাস্ত্রীর কি কোনো দরকার আছে ? রেসিডেন্ট মার্কামও ওয়ারেন হেস্টিংসকে সেই কথাই লিখেছিলেন। চৈত সিং গ্রেফতার হওয়ার সময় কোনো বাধা দেননি। তিনি বলেছিলেন, তাঁর একটি মাত্র প্রার্থনা—তাঁর যেন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা থাকে। তাঁর জমিদারি তাঁর দুর্গ, তাঁর ধনরত্ন এমনকি তাঁর নিজের জীবনও তিনি হেস্টিংসের পায়ে রাখছেন। হেস্টিংস এইবার চৈত সিংকে লিখলেন : ভয়ের কোনো কারণ নেই। মার্কামসাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানাবেন।

চৈত সিং লিখলেন : আপনি আমার রক্ষাকর্তা, আপনি তো আমাকে আপনার স্নেহের ছায়ায় আবৃত করে রেখেছেন। আমি এখন সব দুশ্চিন্তা ও ভয় থেকে মুক্ত। আপনিই আমার প্রভু। আপনি যা বলবেন আমি তাই ঠিক মনে করব।

হেস্টিংস যা চেয়েছিলেন এ-পর্যন্ত তাই হচ্ছিল। রাজাকে বন্দী করার খবর পেয়ে কিন্তু ঘটনা এইবার অন্য দিকে মোড় নিল। রামনগর থেকে দলেদলে সশস্ত্র লোক নদী পার হয়ে চৈত সিংয়ের প্রাসাদের দিকে আসতে লাগল। চৈত সিংয়ের প্রাসাদে যে-সব ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন ছিল তারা হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, তাদের সঙ্গে বন্দুক আছে কিন্তু ভুল করে গুলি আনা হয়নি। মেজর পপাম্‌ বিপদ বুঝতে পেরে বাইরে থেকে অন্য সৈন্যদের খবর দিয়ে ডেকে পাঠালেন। তারা যখন এসে পড়ল তখন প্রাসাদের চারপাশে চৈত সিংয়ের এত প্রজাদের ভিড় যে, ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। সরু গলির ভিতরে ইংরাজ সৈন্যরা সুবিধা করতে পারল না। চৈত সিংয়ের লোকরা শেষপর্যন্ত ইংরাজ সৈন্যদের উপর গুলি ছুড়তে লাগল। চৈত সিং বুঝতে পারলেন যে, ঘটনা যে দিকে যাচ্ছে তাতে তাঁর সর্বনাশ হবে। তিনি একটি ছোট দরজা দিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেলেন। জল সেখান থেকে অনেক নীচে। তিনি নিজের পাগড়ি বারান্দার সঙ্গে বেঁধে তাই ধরে নীচে নেমে গেলেন। সেখানে আগে থেকেই নৌকো রাখা ছিল। সেই নৌকোয় করে তিনি ওপারে রামনগরে পৌঁছে গেলেন।

চৈত সিংয়ের লোকরা যখন প্রাসাদে ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণ করল তখন তাদের কিছু করার সাধ্য ছিল না। অল্প

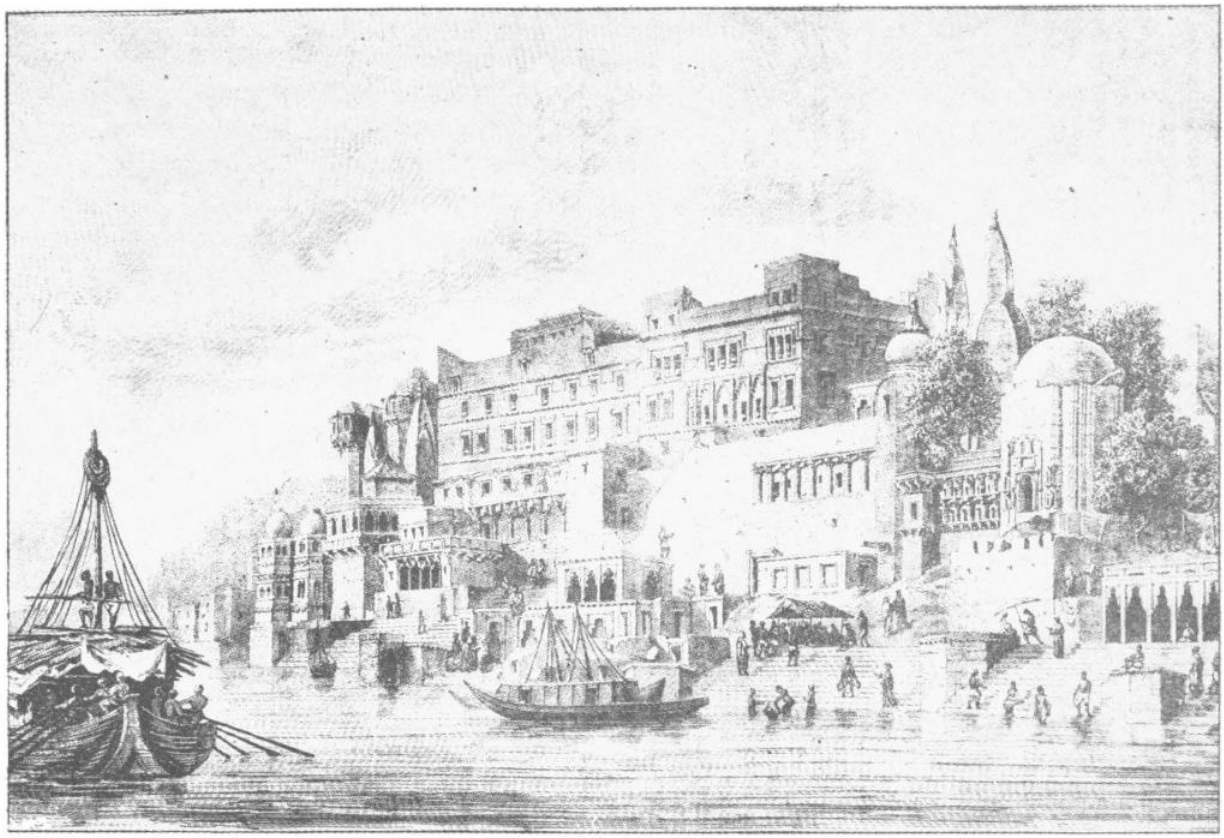

বারাণসীর গঙ্গার ঘাট। এখানেই ছিল চৈত সিংয়ের বাড়ি, এবং এখান থেকেই তিনি গঙ্গা পার হয়ে রামনগরে পালিয়েছিলেন

সময়ের মধ্যে তাদের আর কেউ বাকি রইল না। তিনদিন পরে ওয়ারেন হেস্টিংস এক বড় সৈন্যদল রামনগরে পাঠিয়েছিলেন। রামনগরেও ইংরাজদের সুবিধা হল না। সেখানেও সঙ্কীর্ণ পথ, গলির মধ্যে ইংরাজদের বিপদ হতে লাগল। দুদিকে যদি বড় বাড়ি থাকে তাহলে সেখান থেকে আক্রমণ এলে তাকে প্রতিরোধ করা কঠিন। একজন ইংরাজ কর্মচারী তাঁর সৈন্য নিয়ে কিছু বিবেচনা না করে একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন, সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেননি। ইংরাজ সৈন্যদের এই দ্বিতীয়বার বিপত্তি ঘটল। গুজব রটল যে, এইবার ওয়ারেন হেস্টিংসকেও আক্রমণ করা হবে। সমস্ত এলাকা জুড়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা হচ্ছে। হেস্টিংস জায়গা নিরাপদ না দেখে চুনারে পালিয়ে গেলেন। এই ঘটনাকে নিয়ে একটি ছড়া তৈরি হয়েছিল—

ঘোড়েপর হাওদা, হাথি পর জিন,
জল্‌দি ভাগ গয়া ওয়ারেন হেস্টিন্‌।

হাওদা তো হাতির পিঠে লাগানো হয় কিন্তু ভুল করে তা ঘোড়ার পিঠে লাগাবার চেষ্টা হয়েছিল। এমন গোলমালে বিদ্রোহ খুব তাড়াতাড়ি বারাণসী থেকে ফৈজাবাদ ও তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হল না। জোয়ারের ঢেউয়ের মতো যা কোম্পানির শাসনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল তা আবার ভাটার জলের মতো তাড়াতাড়ি সরেও গেল। উত্তেজনা কমে আসবার পরে হেস্টিংস নতুন ব্যবস্থা নিলেন।

চৈত সিংয়ের পরিবারের একজন, মোহিপনারায়ণকে চৈত সিংয়ের জায়গায় বসানো হল। তাঁর হাতে বেশি ক্ষমতা রইল না। তাঁর বাবা দিগ্বিজয় সিংকে নায়েব করে দেওয়া হল, তাঁর হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা। তাও আবার অনেক ছেঁটে দেওয়া হল। দিগ্বিজয় সিংয়ের বিচার-ব্যবস্থা বা টাঁকশালের উপর কোনো কর্তৃত্ব রইল না। খাজনার হার ওয়ারেন হেস্টিংস প্রায় দ্বিগুণ করে দিলেন। এখন থেকে বছরে চল্লিশ লাখ টাকা।

চৈত সিং ইতিহাস থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এই নিয়ে অনেক আলোচনা চলেছিল। হেস্টিংসের সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, হেস্টিংসের এই কাজ কি উচিত হয়েছিল? চৈত সিং তো সাধারণ জমিদার ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাজা। তাঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার কি উচিত হয়েছিল? হেস্টিংসের কি চৈত সিংয়ের উপর কোনো রাগ ছিল? এই উপলক্ষে তিনি কি শোধ তুলতে চেয়েছিলেন? অন্যদিকে হেস্টিংসের বন্ধুরা বলেছেন যে, হেস্টিংস কোথাও নিয়মের বাইরে কাজ করেননি। ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি যে বাড়তি সাহায্য চেয়েছিলেন তাতে তাঁর অধিকার ছিল। তাছাড়া চৈত সিংয়ের শাসনও খারাপ ছিল। দেশে চুরি-ডাকাতির অন্ত ছিল না। হেস্টিংস যা করেছেন তার ফল ভালই হয়েছে।

শেষ কথা বলা কঠিন। ইংরাজরা বারেবারে বলেছিলেন যে, সমস্ত দেশ জুড়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা চলেছিল। সত্যিই কি তাই হয়েছিল? হয়ে থাকলেও তাতে চৈত সিংয়ের কতটা হাত ছিল! এসব কথার কিন্তু উত্তর দেওয়া এখন আর সম্ভব নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি সার্ফ কেনেন!

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কারণ সার্ফ-এর ওপর খরচ হওয়া একেকটি পয়সা তার প্রভাব দেখিয়ে দেয়। সেজন্যে, যদি আপনি দিলদরিয়া হয়ে খরচ না ক'রে একটু চোখ খুলে খরচ করেন, তাহলে সার্ফ-ই কিনবেন।"

কিন্তু, সস্তার পাউডার কেনায় তো পয়সার দারুণ সাশ্রয় থাকে!

"একদম নয়, কারণ সস্তার জিনিষ আর ভাল জিনিষ কেনায় তফাৎ থাকে। সার্ফ-এর সঙ্গে সস্তার পাউডার কি মোকাবিলা করতে পারে? মেপে-জুপে হিসেব করলে দেখবেন, সার্ফ কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সার্ফ কেনাই কেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

"তাহলে শুনুন, সস্তার পাউডারের পুরো এক কিলোর থলিতে যতটা পাউডার থাকে, সার্ফ-এর শুধু ১/২ কিলোর ডিবেতে থাকে ঠিক ততটা পাউডার।"

কিন্তু তবু…

"প্রশ্নই ওঠেনা—কারণ, সবদিক দিয়ে সার্ফ-এর পাল্লাই ভারী হবে। তাছাড়া, যে কোনো সস্তার পাউডার কি সার্ফ-এর মত কাপড়ে এমন শুভ্রতা আনতে পারে? রঙীন কাপড়ে আনতে পারে এমন ঝলমলে চমক? শুধু সার্ফ-ই এক এমন পাউডার, যা দিয়ে ধুলে কাপড় দেখায় সদা নতুনের মত …বারবার ধোয়ার পরও।"

আপনি ঠিকই বলেছেন…

"আর হ্যাঁ, সার্ফ আমার ত্বকেরও কোনো ক্ষতি করে না—মানে, আমার হাত থাকে একেবারে সুরক্ষিত।"

এবার বুঝলাম, সার্ফ লাভের সওদা কেন?

"সত্যি, তাইতো মাসে মাসে তুচ্ছ কয়েকটা পয়সা বাঁচানোর জন্যে সার্ফ-কে আমি কোনোমতেই ছাড়তে রাজী নই। আরে ভাই, পয়সা বাঁচানোই নয়, বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল ভেবে-চিন্তে খরচ করা।"

মেপে-জুপে সব যাচাই করলাম, সার্ফ-এর সওদাই সেরা মানলাম।

LINTAS SU 320 2619 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

বাবার ছেলেবেলা

শৈবাল মিত্র

চৈতি বলল, "বাবা, তোমার দুষ্টুমির গল্প বলো।"

বাপ্পা কোনো কথা না বলে ড্যাবড্যাব করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু আগে কোথা থেকে একটা টিকটিকির ডিম নিয়ে মৌরি লজেন্স ভেবে বাপ্পা খেয়ে ফেলেছে। সাদা রঙের গোল জিনিসটা যে মৌরি লজেন্স নয়, টিকটিকির ডিম, এটা ধরা পড়ল খানিক পরে। ধরা পড়তে বাড়িতে হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। ডাক্তার এল, ওষুধ এল। ওষুধ-টোষুধ খাওয়ার পর খুব একচোট মায়ের বকুনি খেল বাপ্পা। মা বললেন, "এমন দুষ্টু ছেলে ভূভারতে আর একটাও নেই।"

অফিস থেকে ফিরে বাপ্পার থমথমে, গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়েই বাবা বুঝলেন, কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। বাপ্পার বয়স আট, চৈতির দশ। চৈতি আর বাপ্পাকে ডেকে বাবা বললেন, "চলো ছাতে যাই।"

বাবার সঙ্গে ছাতের ওপর এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই ভাইবোন অবাক হয়ে গেল। কী আলো, কী আলো! আলোয় ফিনিক ফুটছে। পূর্ণিমার রাত। সোনার বেলিথালার মতো একটা মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে আকাশে।

চৈতি আর বাপ্পার দিকে চেয়ে বাবা বললেন, "তোমাদের বয়সে আমিও কম দুষ্টু ছিলাম না!"

কথাটা শুনেই চৈতি আবদার জুড়ল, "তোমার দুষ্টুমির গল্প বলো।"

এক লহমা বাবার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থেকে, দিদির আবদারে বাপ্পা সায় দিল। বাবার ছেলেবেলার গল্প শোনায় ওদের খুব আগ্রহ।

বাবা গল্প শুরু করলেন, "আমি তখন বাপ্পার বয়সী, দু-এক বছর কমবেশি হতে পারে। গাঁয়ের বাড়িতে আমরা থাকতাম। সেদিন সকাল থেকে আমাদের বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। দারুণ হৈচৈ আর উত্তেজনা। বিয়েতে পাওয়া ছোটকাকার রেডিওটা চালু করার জন্যে এরিয়েল খাটানো হচ্ছিল। বাড়ির উত্তর-দক্ষিণে দুটো তালগাছের মাথায় প্রায় দুশো গজ লম্বা এরিয়েলের তারটা টান-টান করে বেঁধে জলিল আর রতন নেমে পড়ল গাছ থেকে। আমাদের মালতীপুর গাঁয়ে প্রথম রেডিও চালু হবে। তাই এরিয়েল বাঁধা দেখতেই প্রায় দুশো লোক জড়ো হয়েছিল। ছোটকাকার দোতলার ঘরের পেছনের আমবাগানে যোগীন দাস তখন মাটি খুঁড়ছে। প্রায় একমানুষ খোঁড়ার পরও ছোটকাকা বলছে, আরো একটু গভীর করতে হবে। গর্তের মধ্যে যোগীন পুরোটা ডুবে গেছে। এই গর্তে রেডিওর আর্থ কানেকশান হবে। কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো অবাক। আনন্দও হচ্ছিল খুব। বাড়িতে বসে দিল্লি কলকাতার গানবাজনা, নাটক শোনা যাবে। অবশ্য কলকাতায় মামার বাড়িতে আগেই আমি রেডিও শুনেছিলাম। মামার বাড়িতে দুটো রেডিও ছিল। ছাতের ওপর একটা ছোট এরিয়েলে দুটো রেডিওরই কাজ চলত। আর্থ কানেকশন বলে কিছু ছিল না। ছোটকাকা ছিলেন রাশভারী, রাগী লোক। অনেকক্ষণ দোটানায় থেকে মামার বাড়ির এরিয়েলের কথাটা শেষ পর্যন্ত বলে ফেললাম ছোটকাকাকে। যা ভেবেছিলাম, তাই হল, ছোটকাকা এক বেজায় ধমক লাগালেন আমাকে।

এক দঙ্গল মানুষের সামনে, বিশেষ করে নতুনকাকিমার সামনে এই অপমানে ভারী রেগে গেলাম আমি। জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো মিলিয়ে আমরা ছিলাম তেইশজন ভাইবোন। বাড়ির সকলে বলত, এই তেইশজনের মধ্যে আমাকেই নাকি ছোটকাকা সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন! এই কি ভালবাসার নমুনা। মনে মনে ঠিক করলাম, সুযোগ পেলেই এমন একটা প্রতিশোধ নেব যে ছোটকাকা মজা টের পাবেন।

"দুপুর শেষ হওয়ার আগেই সুযোগ এসে গেল। ডানহাতে একটা সাদা মোজা পরে সাড়ে-বারোটায় নব ঘুরিয়ে ছোটকাকা রেডিওটা চালু করেছিলেন। অনুরোধের আসর শুরু হওয়ার মুখেই রেডিওটা বন্ধ করে হাতের মোজা খুলে রাখলেন। ঘরে বসে ছিলেন বাড়ির মেয়েরা—জেঠি কাকি মা পিসি এবং পাড়ার অনেকে। তাঁরা হাহা করে উঠলেন। ছোটপিসি বললেন, অনুরোধের আসরটা শুনতে দাও। ছোটকাকা গম্ভীর মুখে বললেন, রেডিওকেও বিশ্রাম দিতে হয়।

"ঘরের সকলে অসন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণের বারান্দায় তাস খেলতে চলে গেল। নীচের আমবাগানেও গাঁয়ের কয়েকশো লোক জড়ো হয়েছিল। তাদের অনেকে চলে গেল, রাতের অধিবেশনের জন্যে থেকে গেল কেউ কেউ। এরিয়েলের খুঁটি, সেই তালগাছগুলোকে দেখার জন্যে ছোটকাকা বেরোতেই আমি দেখলাম, ছোটকাকার ঘরের দরজা হাট করে খোলা, টেবিলের ওপর রয়েছে বিয়েতে পাওয়া ছোটকাকার নতুন ওমেগা ঘড়ি। চারপাশে কেউ নেই। টুক করে ঘড়িটা নিয়ে একতলায় নেমে এলাম। সামনে ভাঁড়ারঘর। ভাঁড়ারঘরের ভেজানো দরজা খুলে চুপচাপ ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঘরের ভেতরে তক্তাপোশের তলায় একটা পেতলের জামবাটিভর্তি দুধ। বাটির মুখে একটা কাঁসার থালা। থালার ওপর নোড়া চাপানো। বাটির ঢাকা খুলে প্রায় চার সের দুধের মধ্যে ছোটকাকার ঘড়িটা ফেলে দিলাম। তারপর বাটিটা আর ঢাকা দিলাম না। আঢাকা বাটি পড়ে রইল। আমি জানতাম, বাড়ির দুটো হুলো আর গোটাচারেক মেনি বেড়াল এখনই এসে বাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমিও তাই চাই। দুধের সঙ্গে ছোটকাকার শখের ঘড়ি বেড়ালের পেটে ঢুকে হজম হয়ে যাক!

"ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়ে দোতলায় এসে ঠাকুরমার ঘরে ভাইবোনদের মাঝখানে শুয়ে পড়লাম। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছিল। কিছুতেই ঘুম আসে না। একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

"কী একটা হৈচৈ শুনে ঘুম ভেঙে যেতে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। বাইরে দিন শেষ হয়ে আসছিল, ফিকে অন্ধকার, ভোর না সন্ধে ধরা মুশকিল। দু-একটা টুকরো কথা কানে যেতেই বুঝলাম, ছোটকাকার ঘড়ি নিখোঁজের খবর জানাজানি হয়ে গেছে। একতলায় কে যেন চেঁচাচ্ছে, ওরে বাবা রে মরে গেলুম, আমি কিছু জানি না।

"মণির গলা। আমি চিনতে পারলাম। মণি আমাদের বাড়িতে কাজ করত। বিছানা ছেড়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম। মণিকে বাঁচাতে হবে। সিঁড়ি ভেঙে আমি নীচে পৌঁছোবার আগেই ফের পিসির গলা শুনতে পেলাম, হতচ্ছাড়া বেড়ালে সব দুধ খেয়ে গেছে। এখন কী দিয়ে সিন্নি মাখা হবে।

"পরপর দুর্ঘটনা, গোটা বাড়ি কাঁপছে। ছোটপিসিই আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, এই তো ছোড়দার ঘড়ি, দুধের বাটিতে। চোর খোঁজা বন্ধ রেখে সকলে ভাঁড়ারঘরের দিকে ছুটল। মার খাওয়ার হাত থেকে মণি বেঁচে গেল। কিন্তু বেড়ালদের ব্যবহারে আমি খুব বিরক্ত হলাম, যাচ্ছেতাই বেড়াল, একটা ঘড়ি পর্যন্ত খেতে পারে না।

"দুধের বাটিতে ঘড়ি পড়া নিয়ে জোর গবেষণা হল। কিন্তু ধাঁধাটা কেউ ধরতে পারল না। সন্ধের পর ছোটকাকার ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, ছোটকাকা ম্লানমুখে ছোটকাকির বিয়ের বেনারসি দিয়ে ঘড়িটা মুছে চলেছেন। আমাকে দেখতে পেলেন না। ছোটকাকার মুখ দেখে আমার খুব কষ্ট হল। ভাবলাম, এখনি ছোটকাকাকে সব বলে দেব।"

"বলেছিলে?" চৈতি প্রশ্ন করল।

মায়ের বকুনির কথা ভুলে গিয়ে বাপ্পা প্রশ্ন করল, "তোমার ছোটকাকা তোমায় বকেছিলেন?"

ছেলেমেয়ের প্রশ্ন শুনে বাবা হাসলেন, বললেন, 'বলেছিলাম।"

"তারপর কী হল," চৈতি আবার খোঁচাল।

বাবা বললেন, "বলেছিলাম, অনেক রাতে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। পূর্ণিমার রাতে মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি হত। সেই সন্ধেগুলোতে আমাদের আনন্দের শেষ থাকত না। লেখাপড়া বন্ধ, শুধু খেলা আর খেলা। আমাদের তেইশজন ভাইবোনের সঙ্গে পাড়ার আরো জনাদশেক ছেলেমেয়ে যোগ দিত। মেয়েরা অবশ্য খেলত না। তারা পুজো, আরতি দেখত, সত্যনারায়ণের পাঁচালি শুনত। চাঁদের আলোয় বাড়ির সামনের খামারে ছেলেরা চোর-চোর খেলত। সেই সন্ধেতেও চোর-চোর খেলা বেশ জমে উঠেছিল। বিরাট খামার জুড়ে তখন অনেক ধানের গাদা, চাঁদের আলোয় সোনার শিবমন্দিরের মতো দেখাচ্ছে।

এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে কয়েকটা পোলকুটির স্তূপ। আঁটিবাঁধা খড়ের গোছার বাইরে যেসব খুচরো খড় পড়ে থাকে, গাঁয়ের মানুষ সেগুলোকে বলে পোলকুটি। মাঠে ধানের গাদা আর পোলকুটি থাকলে চোর-চোর খেলায় খুব মজা। লুকোবার জন্যে অঢেল জায়গা মেলে।

"ভজা চোর হওয়ার পর একটা পোলকুটির স্তূপের মধ্যে আমি লুকিয়েছিলাম। কুচো খড়ের নরম গদির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল আমার শরীর। চাঁদের আলোয় গাছপালা, পুকুর আর জোনাকির ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর আর কিছু খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙতে দেখলাম, চারপাশ অন্ধকার, নির্জন, জনমনিষ্যির সাড়া নেই। সেদিনও আকাশে এরকম একটা বিরাট চাঁদ উঠেছিল, জ্যোৎস্নায় ধবধব করছিল চারপাশ। হঠাৎ কাছাকাছি কোনো-একটা ঝোপের ভেতর থেকে একদল শেয়াল ডেকে উঠল, হুক্কা হুয়া··· হু··· হু···হুয়া। শেয়ালের ডাক শুনে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। ধড়ফড় করে উঠে বসতে শরীরের চাপে পোলকুটি খড়মড় করে উঠল। তখনই বুঝলাম বাড়িতে নয়, খামারের মধ্যে আমি ঘুমোচ্ছি। অন্ধকার, নিঝুম পৃথিবীর দিকে এবার ভাল করে তাকালাম। একটু দূরে নারকোলগাছের সারি। লম্বা লম্বা গাছ, ঝালরের মতো চিকন সবুজ পাতা, মৃদু হাওয়ায় পাতাগুলো দুলছে। বুঝতে পারলাম, সত্যনারায়ণ পুজো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে, বাড়ির সকলে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। তাহলে ? এখন আমি বাড়ি ফিরব কী করে ? ভীষণ কান্না পেল আমার। আবার আকাশের দিকে তাকালাম। দেখলাম আকাশের চাঁদও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তাকিয়ে আছে আর বলছে, ভয় কী ? আমি স্পষ্ট শুনলাম, চাঁদ বলছে, ভয় কী ? আমার ভয় কেটে গেল, আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"ঠিক তখনই দুটো হ্যারিকেন আর একটা পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ নিয়ে কয়েকজন হৈহৈ করে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। সকলের সামনে ছোটকাকা। ছোটকাকা জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, ঘুমিয়ে পড়েছিলি ? আমি বললাম, হুঁ।

"বাড়ি ফিরে ছোটকাকা বললেন, কেউ ওকে বকবে না। আজ রাতে ও আমাদের কাছে শোবে।

"অনেক রাতে ছোটকাকা আর ছোটকাকিমার মাঝখানে শুয়ে ঘড়ির ঘটনাটা আমি বলে দিলাম। ঘর অন্ধকার, আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। ছোটকাকা আমার মাথায় আস্তে করে হাত রাখলেন। চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে বললেন, তুই বড় হলে ওই ঘড়িটা আমি তোকে দেব।"

"দিয়েছিল ?" চৈতি প্রশ্ন করল।

ছেলেমেয়ের সামনে নিজের বাঁ হাতটা এগিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, "এই সেই ঘড়ি।"

বাবার কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটার ওপর চৈতি আর বাপ্পা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

চাঁদের আলোয় বাবার হাতের ঘড়িটা শুধু নয়, অনেকবার দেখা ঘড়িটার মধ্যে, বাবার ছেলেবেলাকেও ওরা যেন দেখতে চাইছিল।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দুই লিমেরিক

রবিদাস সাহারায়

রাজামশাই নিত্য ভোগেন অজীর্ণ আর অম্বলে,
মাংস লুচির স্বাদটা মেটান শুক্তোতে আর দম্বলে !
সদাই 'আহা' 'উহু' করেন
কখন বাঁচেন কখন মরেন,
তাইতো এখন নেই অরুচি হয়তো লোটা কম্বলে।

●

দুর্গাপুরের দুঁদে মানুষ দুর্গাচরণ বারিক,
দ্বারভাঙ্গা থেকে এলেন দ্বারকা আর দ্বারিক।
বিরাট ভোজের নিমন্ত্রণে
সবাই যাবে চম্পারণে,
কিন্তু কবে ভোজটা হবে ভুলেই গেছে তারিখ।

অঙ্ক-টঙ্ক

অশোককুমার মিত্র

চারজন-ই চার্বাক, নির্বাক এক,
মিলে হল কয়জন ? যোগ করে দ্যাখ্।
পাঁচজনা ? হল না তো, অঙ্কের ফাঁকি
ধরতেও পারলি না, নেহাত চালাকি।
নির্বাক চার্বাক ছিল একজন,
বাকি যারা তিনজন রইল এখন,
তারা সব বকবক সদা কথা বলে।
হিসাবের চালাকিটা বুঝি এর ফলে—
জলবৎ তরলম্ হল ঠিকঠাক,
সেই দলে ছিল মোট চার চার্বাক।

ছবি : দেবাশিস দেব

টিনটিন

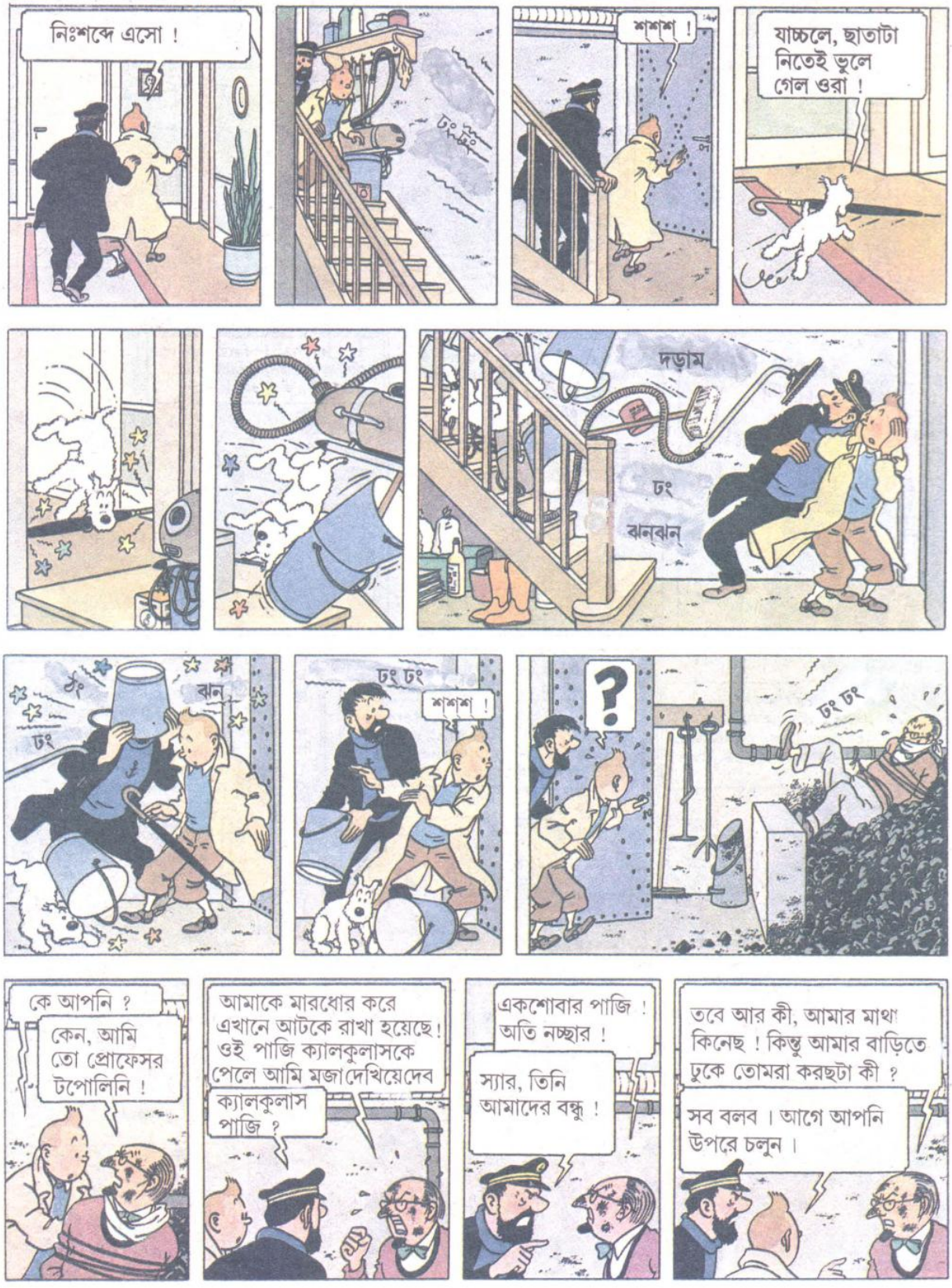
নিঃশব্দে এসো !
ঢং ঢং
শশশ !
যাচ্চলে, ছাতাটা নিতেই ভুলে গেল ওরা !
দড়াম
ঢং
ঝনঝন
ঝন
ঢং
ঢং ঢং
শশশ !
?
ঢং ঢং
কে আপনি ?
কেন, আমি তো প্রোফেসর টপোলিনি !
আমাকে মারধোর করে এখানে আটকে রাখা হয়েছে! ওই পাজি ক্যালকুলাসকে পেলে আমি মজা দেখিয়েদেব
ক্যালকুলাস পাজি ?
একশোবার পাজি ! অতি নচ্ছার !
স্যার, তিনি আমাদের বন্ধু !
তবে আর কী, আমার মাথা কিনেছ ! কিন্তু আমার বাড়িতে ঢুকে তোমরা করছটা কী ?
সব বলব । আগে আপনি উপরে চলুন ।

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

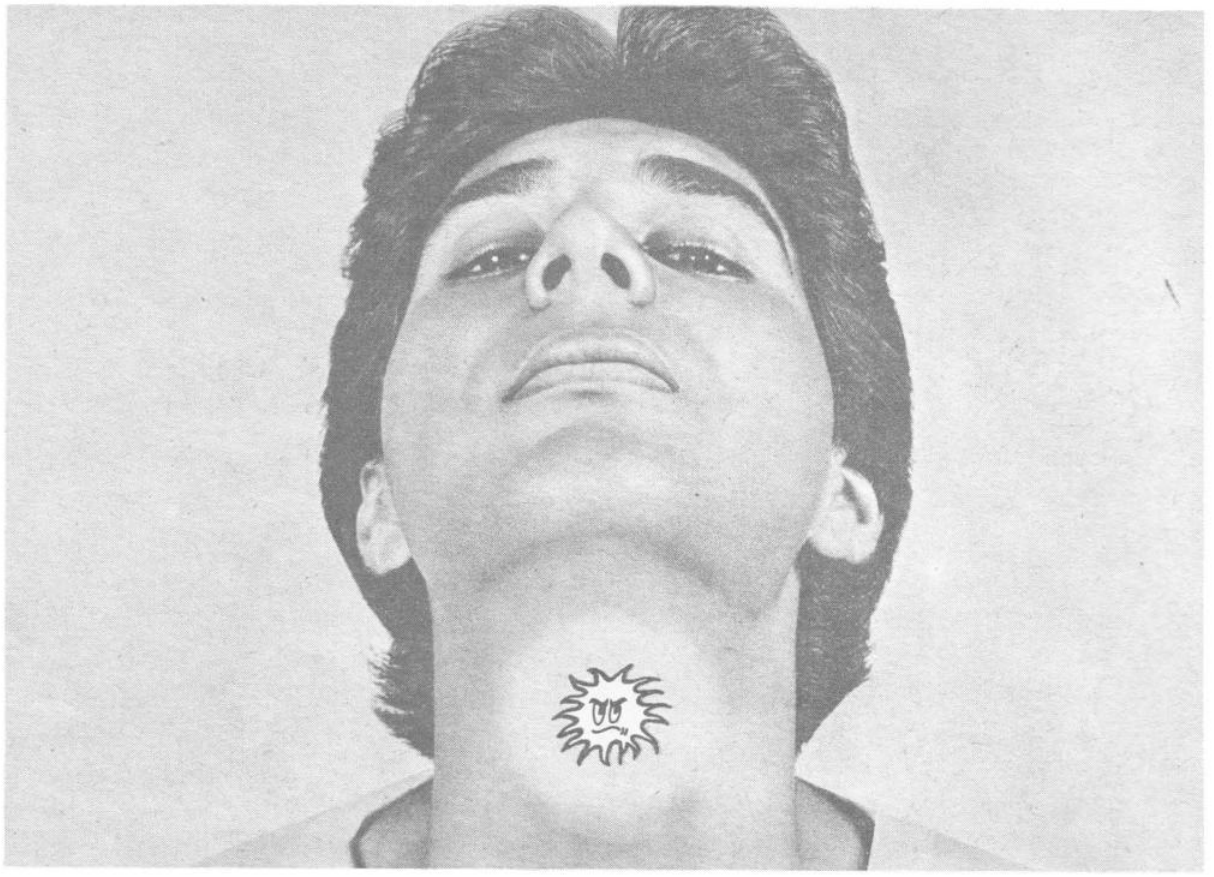

গলার 'খিচখিচ' দূর করুন...

'খিচখিচ' কি ?

যখনই আপনার গলা খুশখুশ করবে, অথবা গলা শুকিয়ে যাবে —তখনই বুঝবেন যে আপনার গলায় 'খিচখিচ' এসেছে।

ভিক্স নিয়ে নিন 'খিচখিচ' দূর করুন

ভিক্স নিয়ে নিন
ভিক্স কাশির বড়িতে গলায় আরামদায়ক ৬ টি ভিক্সের ঔষধি আছে, যা 'খিচখিচ' দূর করে।
তার জন্য যখনই গলায় 'খিচখিচ' আসবে, ভিক্স নিয়ে নিন।

ভিক্স নিয়ে নিন!

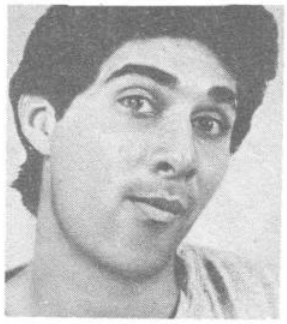

OBM/1829 BEN

বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : বোহেমিয়ারাজের ব্যক্তিগত কাগজপত্র উদ্ধারের জন্যে সহিসের ছদ্মবেশ ধারণ করে হোমস সারাদিন কাটিয়েছেন ব্রিওনি লজের কাছাকাছি। আইরিন অ্যাডলারের সম্বন্ধে যা জানবার, তা তাঁর জানা হয়ে গেছে। এখন হোমস নাটকের শেষ অঙ্কের জন্যে প্রস্তুত···

॥ চার ॥

একটা চমৎকার ল্যাণ্ডো ব্রিওনি লজের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। গাড়িটা থামতে না থামতেই একটা লোক দৌড়ে গেল গাড়ির দরজা খুলে দু-চার পয়সা পাবার জন্যে। একই উদ্দেশ্যে আর-একজন লোকও ছুটে গেল। আর কে দরজা খুলবে এই নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। আর অমনি ঐ সময়ে ঐখানে যত লোক ছিল সবাই ছুটে গিয়ে এক-একজনের পক্ষ নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগল।

এরই মধ্যে ভদ্রমহিলা গাড়ি থেকে নেমে খুব মুশকিলে পড়ে গেলেন। তাঁকে ঘিরে দুপক্ষের বচসা তখন পুরোদমে জমে উঠেছে। এর মধ্যে কে আবার কাকে যেন দু এক ঘা দিয়ে দিয়েছে। হোম্‌স ভদ্রমহিলাকে ওদের মধ্যে থেকে বের করে আনবার জন্যে ছুটে গিয়েই আর্তনাদ করে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল ; তার মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মজাটা হল তারপর। হোম্‌সকে ঐভাবে পড়ে যেতে দেখে বেশির ভাগ লোকই সেখান থেকে সরে পড়ল। আইরিন এই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাড়ির দরজা থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "উনি কি খুব বেশি চোট পেয়েছেন ?"

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, "লোকটা মরে গেছে।"

"না, না, এখনো বেঁচে আছে। তবে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই শেষ হয়ে যাবে।"

একজন ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "ফাদারের খুব সাহস। উনি ছুটে না গেলে ঐ গুণ্ডা-বদমায়েসগুলো মাদামের ঘড়ি আর ব্যাগ ছিনতাই করে পালাত।"

"এঁকে তো এইভাবে রাস্তায় ফেলে রাখা যায় না। যতক্ষণ না চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় এঁকে আপনার বাড়িতে শুইয়ে রাখা যাবে কি ?"

"নিশ্চয়ই। ওঁকে ভেতরে নিয়ে এসে আরাম করে শুইয়ে দাও," আইরিন জবাব দিলেন।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি দেখলুম কীরকম ধরাধরি করে হোম্‌সকে আইরিনের বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এই রকম কপটতা করতে আমার খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু আমি নিরুপায়। হোম্‌সের সঙ্গে কথার খেলাপ করাটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা হবে এই ভেবে মনকে শক্ত করে পটকা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

খানিকক্ষণ পরে দেখলুম হোম্‌স ধীরে ধীরে উঠে বসে এমন ভাব করছে যেন তার দমবন্ধ হয়ে আসছে। কে একজন তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকের একটা জানলা খুলে দিলে। আমি জানলাটার দিকে এগিয়ে যেতে না যেতেই হোম্‌স তার একটা হাত তুললে। আর তৎক্ষণাৎ পটকা ছুঁড়ে দিয়েই আমি 'আগুন' বলে চিৎকার করে উঠলুম। আমার মুখের কথা খসতে না খসতেই সেখানে যত লোক ছিল সবাই 'আগুন, আগুন' বলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলে। আমি দেখলুম সেই ঘরটা থেকে হু-হু করে চাপ চাপ কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। দু-চার মিনিট পরে হোম্‌স বেরিয়ে এসে সকলকে আশ্বাস দিয়ে জানালে যে আগুন-টাগুন কিছু লাগেনি। আমি তখন বড় রাস্তার দিকে পা বাড়ালুম।

"ডাক্তার, তোমার অপারেশন সাকসেসফুল, খুব ভাল হয়েছে," হোমস আমার পিঠ চাপড়ে দিলে।

"ছবিটা উদ্ধার করতে পেরেছ ?"

"আমি জানতে পেরেছি সেটা কোথায় আছে।"

"কীভাবে ?"

"তোমাকে যা বলেছিলুম। উনিই আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন।"

"বুঝতে পারলুম না।"

"তবে শোনো ডাক্তার। এটা নিশ্চয়ই বুঝেছ যে, আজকের সবটাই সাজানো ঘটনা। এরা সকলেই আমার ভাড়া-করা লোক।"

"সেটা বুঝেছি।"

"এখন বাকিটা শোনো। যখন গোলমাল আরম্ভ হল তখন আমি তো ছুটে গেলুম। গোড়া থেকেই আমার হাতের চেটোয় লাল রঙ লাগানো ছিল। আমি দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে পড়ে যাবার সময় সব রঙটা সারা মুখে ভাল করে লাগিয়ে নিলুম। এটা অবশ্য খুবই পুরোনো কৌশল। তারপর আমাকে তো ধরাধরি করে আইরিনের খাসকামরায় নিয়ে গিয়ে একটা বড় সোফায় শুইয়ে দিলে। এই ঘরটার ওপর আমার গোড়া থেকেই নজর ছিল। এটা বাইরের বসবার ঘর আর আইরিনের শোবার ঘরের মাঝখানে। তারপর আমি এমন ভাব করলুম যেন বন্ধ ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তখন রাস্তার দিকের জানলা খুলে দেওয়া হল। আর তুমিও ঠিক তালমাফিক পটকাটা ছুঁড়লে।"

"তাতে তোমার কী সুবিধে হল ?"

"ঐটেই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তুমি লক্ষ করেছ কি না জানি না, বাড়িতে আগুন লাগলে বাড়ির মেয়েরা আগে বাঁচাতে যায় সে জিনিসটা যেটা তার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। ডার্লিংটন তদন্তের সময় দেখেছিলুম বাড়িতে আগুন লাগতেই ভদ্রমহিলা ছুটলেন তাঁর বাচ্চা ছেলে যেখানে ছিল সেইখানে। আর আর্নসওয়ার্থ ক্যাসল তদন্তের সময় দেখেছিলুম আগুন লেগেছে শুনেই ভদ্রমহিলা দৌড়েছিলেন নিজের গয়নার বাক্স

সামলাতে। আজও একই ব্যাপার হল। ঐ চাপ-চাপ কালো ধোঁয়া আর হৈ-হট্টগোলে যে-কোনো লোকই ঘাবড়ে যেত। ছবিটা আছে ঘরের দেওয়াল বরাবর যে কাঠের প্যানেল আছে তার ডান দিকের ঘণ্টাটানা দড়ির পেছনের একটা খোপে। আমি আড়চোখে দেখলুম আগুন লেগেছে শুনেই ভদ্রমহিলা ঐখানকার প্যানেলটা ঠেলে সরিয়েছেন। আমি যখন বললুম যে আগুন লাগেনি, তখন তিনি চট করে সেখান থেকে সরে এসে পটকাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও সেই সুযোগে পালিয়ে এলুম। একবার ভেবেছিলুম ছবিটা নিয়েই আসি। কিন্তু দেখলুম কোচোয়ান সেখানে হাজির রয়েছে।

"আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ। কাল সকালে বোহেমিয়ার রাজাকে সঙ্গে নিয়ে আইরিনের সঙ্গে দেখা করতে আসব। তিনি যখন সাজগোজ সেরে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন ততক্ষণে আমরা ছবিটা বগলদাবা করে ওখান থেকে লম্বা দেব।"

"কাল কখন আসবে?"

"এই ধরো আটটা নাগাদ।"

এইসব আলোচনা করতে করতে আমরা বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেছি। হোম্‌স্ পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলছিল এমন সময় একজন পথচারী বললে, "শুভরাত্রি

আগামী সংখ্যা থেকে

এই সিরিজের নতুন কাহিনী

লালচুল সমিতি

মিস্টার শার্লক হোমস।" রাস্তায় তখন অনেক লোক ছিল তাই কে যে বললে ঠিক বোঝা গেল না। মনে হল একটি যুবকই বোধহয় সম্ভাষণ করলে।

হোমস্ বললে, "গলাটা চেনা-চেনা ঠেকল। ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

॥ ৩ ॥

সেই রাত্রিটা আমি বেকার স্ট্রিটে কাটালুম। পরদিন সকালে আমরা কফি টোস্ট দিয়ে সবেমাত্র ব্রেকফাস্ট সাঙ্গ করেছি, আর তখনি বোহেমিয়ার রাজা এলেন।

"আপনি ছবিটা পেয়েছেন?" তিনি অধীরভাবে প্রশ্ন করলেন।

"পাইনি তবে পাবার আশা রাখি।"

"তাহলে চলুন ছবিটা উদ্ধারের জন্যে যাওয়া যাক।"

"হ্যাঁ। দাঁড়ান, আগে একটা গাড়ি ডাকাই।"

"কেন আমারই তো গাড়ি রয়েছে।"

"চলুন।"

ব্রিওনি লজে পৌঁছে দরজার বেল টিপতেই একজন বয়স্কা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে বললে, "আপনাদের মধ্যে কেউ কি মিস্টার শার্লক হোম্‌স?"

"আমিই শার্লক হোম্‌স," বিস্মিত হয়ে আমার বন্ধু উত্তর দিলে।

"আমাদের গিন্নিমা বলছিলেন যে, আপনি হয়তো আসতে পারেন। তিনি আপনাকে বলতে বলেছেন যে আজ ভোরে ৫-১৫ মিনিটের ট্রেনে তিনি চেয়ারিং ক্রশ থেকে ইউরোপের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন।"

"সে কী। তিনি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে গেছেন?"

"হ্যাঁ। আর তিনি কখনো ইংল্যাণ্ডে ফিরবেন না।"

হতাশায় ভেঙে পড়ে বোহেমিয়ার রাজা বললেন, "তাহলে ছবি আর কাগজপত্রগুলোও ফেরত পাওয়া যাবে না।"

"চলুন দেখি," বলে একরকম জোর করে সেই পরিচারিকাকে সরিয়ে দিয়ে হোম্‌স ঘরে ঢুকে গেল। তারপর সেই খাসকামরার ঘণ্টা-টানা দড়ির কাছে কাঠের প্যানেল সরিয়ে একটা খোপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হোম্‌স সেখান থেকে একটা ছবি আর খাম বের করলে। ছবিটা সান্ধ্য পোশাক পরা আইরিন অ্যাডলারের। আর খামটার ওপরে লেখা শার্লক হোম্‌স এস্কোয়ার।

খাম ছিঁড়ে হোমস চিঠিটা পড়তে শুরু করলে।

প্রিয় মিস্টার শার্লক হোম্‌স,

সত্যই আপনার ক্ষমতা অসাধারণ। আপনি আমাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছেন। কিন্তু আগুনের মিথ্যে হল্লার আগে পর্যন্ত আমি কোনোরকম সন্দেহই করতে পারিনি। কিন্তু যখন ব্যাপারটা বুঝলুম তখন আমি ধরা পড়ে গেছি। অনেকদিন আগে আমাকে বহু লোক আপনার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে, বোহেমিয়ার রাজা যদি নিজের কাজ হাঁসিল করবার জন্যে কোনো লোককে নিযুক্ত করেন তো সে লোক হলেন আপনি। তারা আপনার ঠিকানাও আমাকে দিয়েছিল। এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন।

মনে মনে সন্দেহ হলেও একজন নিরীহ পাদ্রিকে এর সঙ্গে জড়াতে মন চাইছিল না। যাই হোক, আপনি হয়তো জানেন যে, একসময়ে আমিও অভিনয় করতুম। তাই পুরুষের ছদ্মবেশ ধরা আমার পক্ষে মোটেই শক্ত নয়। তাই আমার কোচোয়ান জনকে আপনার ওপর নজর রাখতে বলে আমি মেকআপ' নিতে যাই। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আপনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে অনুসরণ করি।

আপনার বাড়ির দরজার কাছে এসে নিশ্চিত হলুম যে বিখ্যাত শার্লক হোম্‌স আমার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন। অহমিকার বশে আমি আপনাকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে আসি।

তারপর ভেবে ভেবে ঠিক করি যে আপনার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে এখান থেকে পালানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। কাল সকালে আপনি এসে দেখবেন পাখি উড়ে গেছে। ভাল কথা, আপনার মক্কেলকে বলবেন ছবির জন্যে তিনি যেন বিন্দুমাত্র উদ্বেগ না করেন।...

ইতি

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

আইরিন নর্টন (অ্যাডলার)

এইভাবে এই কাহিনীর ওপর যবনিকা পড়ল। বোহেমিয়ার রাজা কেলেঙ্কারির ভয় থেকে মুক্তি পেলেন ঠিকই কিন্তু শার্লক হোম্‌সের সমস্ত প্ল্যানকে উলটে দিলেন অসামান্য বুদ্ধিমতী এক মহিলা। (শেষ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

মাধ্যমিকে প্রথম মনোজিৎ এবং দ্বিতীয় শুভেন্দুবিকাশ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

এবার মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র মনোজিৎ সেনগুপ্ত। বাবা শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে লিয়াজঁর কাজ করেন। মা শ্রীমতী ছায়া সেনগুপ্ত। দাদা বসুজিৎ পুরুলিয়া থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। কলেজ জীবন শুরু করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজে। মনোজিৎ-ও তাই। ১৬ জুন গেজেটে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল মনোজিতের। সরকারিভাবে তার প্রথম হওয়ার খবর বেরোল ২ আগস্টে। ৮২১ পেয়েছে সে। বাংলা-মাধ্যমে মাধ্যমিক পাশ করে সে এখন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়েছে। এবার মাধ্যম ইংরেজি।

নরেন্দ্রপুরে ভাইস প্রিন্সিপালের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। ব্রহ্মানন্দ ভবনের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তরুণমহারাজ বললেন, "মনোজিৎ আমার ভবনের বোর্ডার। এক-দিনেই বুঝেছি ছেলেটি শুধু লেখাপড়াতেই নয়, আচার-ব্যবহারেও ভাল।"

সৌম্য চেহারা মনোজিতের। কথাবার্তা বলে ধীরে ধীরে। সেইভাবেই সে জানাল তার নম্বর। বাংলা ১৫৪, অঙ্ক ১০০, ইংরিজি ৭০, ফিজিক্যাল সায়েন্স ৯৪, লাইফ সায়েন্স ৮৭, ইতিহাস ৮৪, ভূগোল ৮৯, অ্যাডিশন্যাল অঙ্ক ৮৮, ওয়ার্ক এডুকেশন গ্রুপে ৮৯।

ক্লাস সিক্স থেকে সে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ছে। এ-বছর ঐ স্কুল থেকে পার্থকুমার রায়, সুমন মল্লিক এবং অমিতাভ দাসও স্ট্যাণ্ড করেছে।

তুমি কীভাবে পড়াশোনা করতে আর কী কী বই পড়তে, এই প্রশ্নের জবাবে মনোজিৎ একে একে সব বলল। বাংলায় নোটবই পড়েনি। স্কুলের শিক্ষকরা ক্লাসে যা পড়াতেন এবং নোট দিতেন, তা-ই যথেষ্ট। সে প্রশ্নোত্তর লিখত এবং শিক্ষকরা তা সংশোধন করে দিতেন। টেক্সট বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ত। বাংলায় সে লিখত চলিত গদ্যে। বানানের ব্যাপারে সংসদ অভিধান। বাংলার শিক্ষক ফণিভূষণ খাটুয়ার কাছে সে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ বামনদেব চক্রবর্তীর ব্যাকরণ-বইয়ের কাছে। রচনার ব্যাপারে পি আচার্যের ডিগ্রি কোর্সের বইটা কাজে লেগেছে। ইংরেজিতে পি কে দে সরকার আর পি মাহাতোর বই। অঙ্কে কে সি নাগ, মাইতি-ভট্টাচার্য, মৃদুল সেন ও কৃষ্ণপদ গাঙ্গুলির গ্রন্থ। ফিজিক্যাল সায়েন্সে

দত্ত পাল চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, পি কে দত্ত, পোদ্দার হালদার এবং ডি পি রায়চৌধুরীর বই। লাইফ সায়েন্সে অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী, সান্যাল চ্যাটার্জি, কুণ্ডু দাশ কুণ্ডু। ইতিহাসে অতুলচন্দ্র রায়, প্রভাতাংশু মাইতি, কিরণ চৌধুরী। ভূগোলে সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য এবং লাহিড়ী ও সেনগুপ্তের 'ভারত ও বসুধা'।

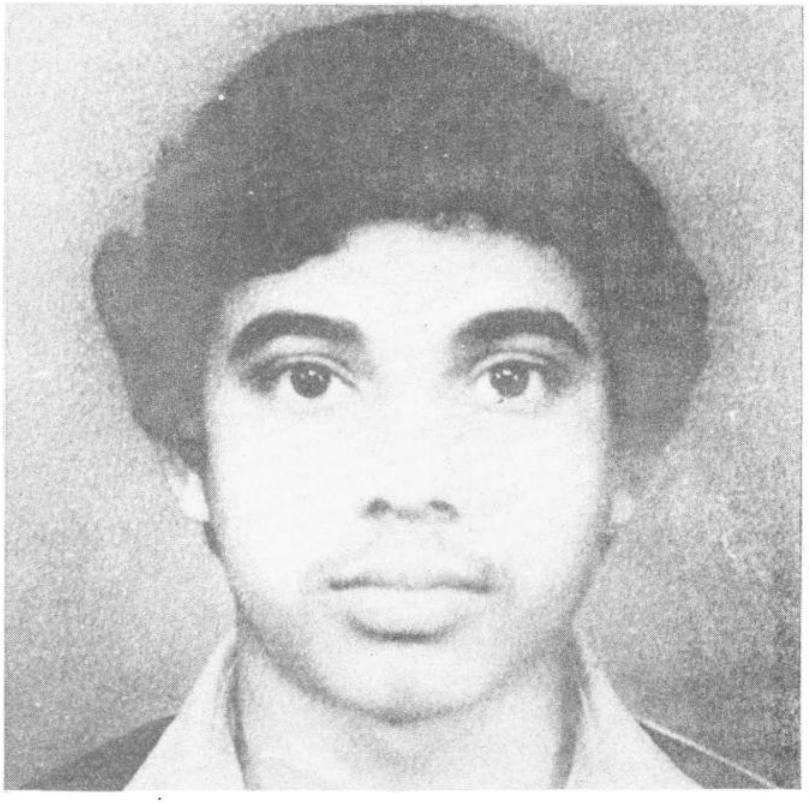

পড়াশোনার পদ্ধতির ব্যাপা... কথা এই বার-বার একটা কথাই বলল। ক্লাসকে অনুসরণ করার কথা। টেক্সট বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া আর বিভিন্ন রেফারেন্স-বই পড়ার ব্যাপারেও সে জোর দিল। অনবরত লিখতে হবে। এবং সেই লেখা শিক্ষকমশাইদের দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিতে হবে।

শান্ত মধ্যাহ্ন। নরেন্দ্রপুরের সমস্ত পরিবেশটা শান্ত। আমরা মুখোমুখি। জিজ্ঞেস করলুম, "আচ্ছা, তুমি কি জানতে ফার্স্ট হবে?" মনোজিৎ লাজুক হাসি হাসল। বলল, "তা ভাবিনি। তবে ৮২০—২৫ পাব এটা আশা করেছিলুম।"

"আচ্ছা মনোজিৎ, তুমি এখানে ভর্তি হলে কেন?"

"পুরুলিয়ায় একাদশ-দ্বাদশ নেই। ছোটবেলা থেকে হস্টেলে থেকে পড়ার অভ্যাস। আর তাছাড়া এখানে পড়ার আমার বরাবরের ইচ্ছে।"

বেশী সুস্বাদু বেশী সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত উপকারী।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।

এটি মেশানো একদম সোজা। এটি খাওয়ানো একেবারে সহজ। প্রোটিনে ভরপুর বলেই শিশুর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দরকারী।
বাড়তি আয়রন রক্তকে সুস্থ রাখবার জন্য।
সঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস দাঁত ও হাড় আরো মজবুত করবার জন্য।
শিশুর কোমল হজমশক্তির উপযোগী করে আগেই রান্না করে রাখা হয়েছে।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
আরো সম্পূর্ণ শক্ত আহার।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

CLARION/B/GX/4/244 BEN

বিনামূল্যে! শিশুর প্রথম বছরের খাতার জন্যে, পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ টাকার স্ট্যাম্পসমেত লিখুন ঃ পোঃ বঃ নং **19119** বোম্বাই·(FCM-3) **400 025**

মুহূর্তে তোমার মনে পড়ছে ?"

"সকলের। স্বামী উমানন্দ আমাদের সেক্রেটারি। তাঁর সহকারী স্বামী পূতানন্দ। প্রধান শিক্ষক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। অঙ্কের স্যার ও আমাদের ওয়ার্ডেন এস এল পেরুমল ইত্যাদি সকলের কথা। তাছাড়া আমার শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কথাও বলতে চাই। তাঁদের বাণী ও দর্শন আমাকে আকর্ষণ করে। খেলাধুলোতে আমার সবচেয়ে আনন্দ। হকি, ফুটবল খেলা বিশেষ করে। আমি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র, আর এ-কালের সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।"

ভবিষ্যতে আই আই টি-তে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে মনোজিতের পড়ার ইচ্ছে আছে।

*

এ বছর মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকার করেছে হিন্দু স্কুলের শুভেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য। পেয়েছে ৮০৭। হিন্দু স্কুলেই সে একাদশ বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছে। টেস্টে অবশ্য সে ফার্স্ট হয়নি। হয়েছিল সুমন্ত্র সরকার। সুমন্ত্র মাধ্যমিকে নবম স্থান পেয়েছে। টেস্টে অর্পণ পাল সেকেণ্ড হয়েছিল। ফাইনালে বিংশ স্থান পেয়েছে। হিন্দু স্কুলের হেডমাস্টার শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী জানালেন ১৯৭৯-তে এখান থেকে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেছিল যথাক্রমে অভিজিৎ চৌধুরী, দেবাংশু মজুমদার এবং ভাস্করজ্যোতি দাস।

আমহার্স্ট স্ট্রিট আর বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের কাছাকাছি ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের ক্লিনিক্যাল টিউটর ডাঃ শ্যামাদাস ভট্টাচার্যের বাড়ি। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শ্যামলী ভট্টাচার্য। তাঁদেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র শুভেন্দুবিকাশ।

সে মোট নম্বর পেয়েছে ৮০৭। বাংলা ১৪৯, অঙ্ক ৯৯, ইংরেজি ৬৫, ফিজিক্যাল সায়েন্স ৯৫, লাইফ সায়েন্স ৮৮, ইতিহাস ৮০, ভূগোল ৮৭, অ্যাডিশন্যাল মেকানিক্স ৯৩, ওয়ার্ক এডুকেশন গ্রুপে ৯৩।

শুভেন্দু সাহিত্যপাগল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার পোকা। নিজেও কবিতা লেখে। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার পাঁজড়া গ্রামে ওদের বাড়ি। পিতামহ ত্রিপুরাচরণ স্মৃতিতীর্থ। সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের জন্যে ১৯৮৩-তে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন।

পড়াশোনার ব্যাপারে প্রশ্ন করাতে শুভেন্দু বলল, "সেকেণ্ড হব ভাবিনি। তবে ৮০০ পাব, এটা আশা করেছিলুম।"

বাংলায় সে বি চৌধুরীর নোট পড়েছে। চলিত ভাষায় লেখা তার অভ্যাস। বাংলা রচনা ও ইতিহাসের উত্তর লেখার ব্যাপারে সে ভূমিকা ও উপসংহারের উপর জোর দেয়।

বামনদেব চক্রবর্তীর ব্যাকরণ তাকে খুবই সাহায্য করেছে। ইংরেজিতে পি কে দে সরকার ও পি মাহাতো। হিন্দু স্কুলের সদ্য-প্রয়াত মাস্টারমশাই শিশির হাজরার কাছে সে চিরঋণী। তিনি তাকে ইংরেজিতে খুবই সাহায্য করেছেন। স্কুলে অঙ্কের বই ছিল দাস-বর্মনের। কেশব নাগের বই দেখে সে অঙ্ক করেছে। তা ছাড়া 'সেভেন টিচার্স'-এর বই। ফিজিক্যাল সায়েন্সে ম্যাকমিলান কোম্পানির বই। সুখেন্দু মাইতির বই। লাইফ সায়েন্সে অমূল্যভূষণের বই, কুণ্ডু-দাস-কুণ্ডুর বই। ইতিহাসে প্রভাতাংশু মাইতি ও কিরণ চৌধুরীর পুরনো সংস্করণ। কুম্ভার বই। ভূগোলে 'ভারত ও বসুধা'। মেকানিক্সে দাস-মুখার্জির হায়ার সেকেণ্ডারির বই।

ছোটভাই দিব্যেন্দু হিন্দু স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। ছোট বোন অপরাজিতা টাকি স্কুলে টুতে পড়ে।

মোহনবাগানের সাপোর্টার।

শুভেন্দু পাক্ষিক আনন্দমেলার এক মুগ্ধ পাঠক। গল্প উপন্যাস তো পড়েই। লেখাপড়া বিভাগটি তার প্রিয়। প্রত্যেক বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ের মধ্যে যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়, তাদের কথা সে পড়ে। এই পাঠ থেকেই তার মনে একদিন যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, আজ তা সফল হল।

মনোজিৎ ধীর শান্ত ছেলে। শুভেন্দুকে একটু চঞ্চল মনে হল। তবে দু'জনেই যে ভাল ছেলে, এটা বলতেই হবে। শুধু লেখাপড়াতেই নয়। ব্যবহারেও।

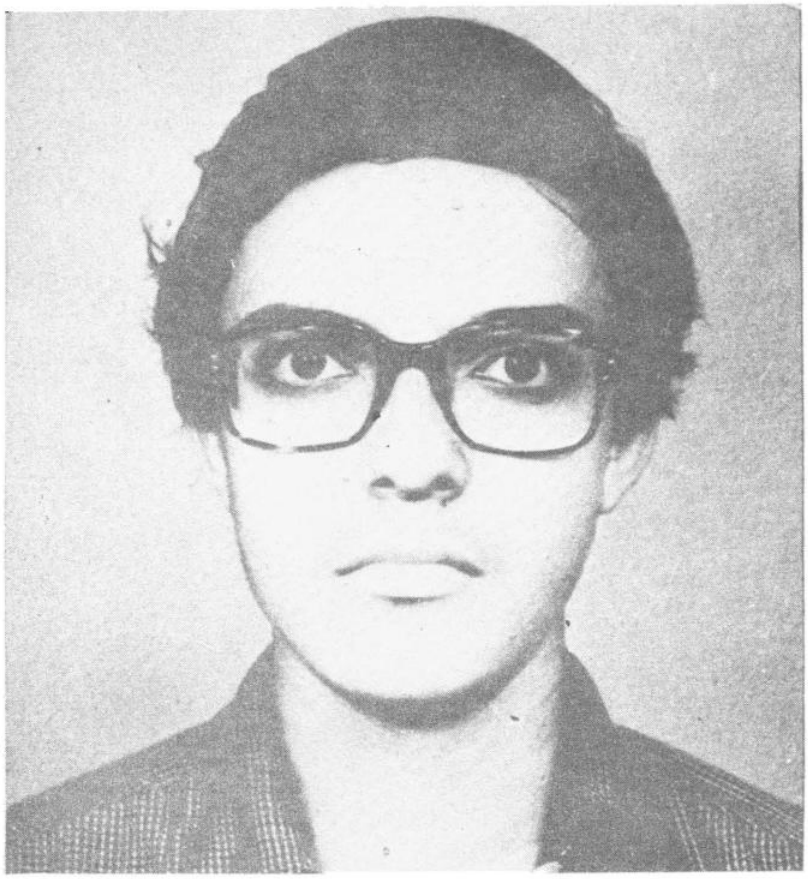

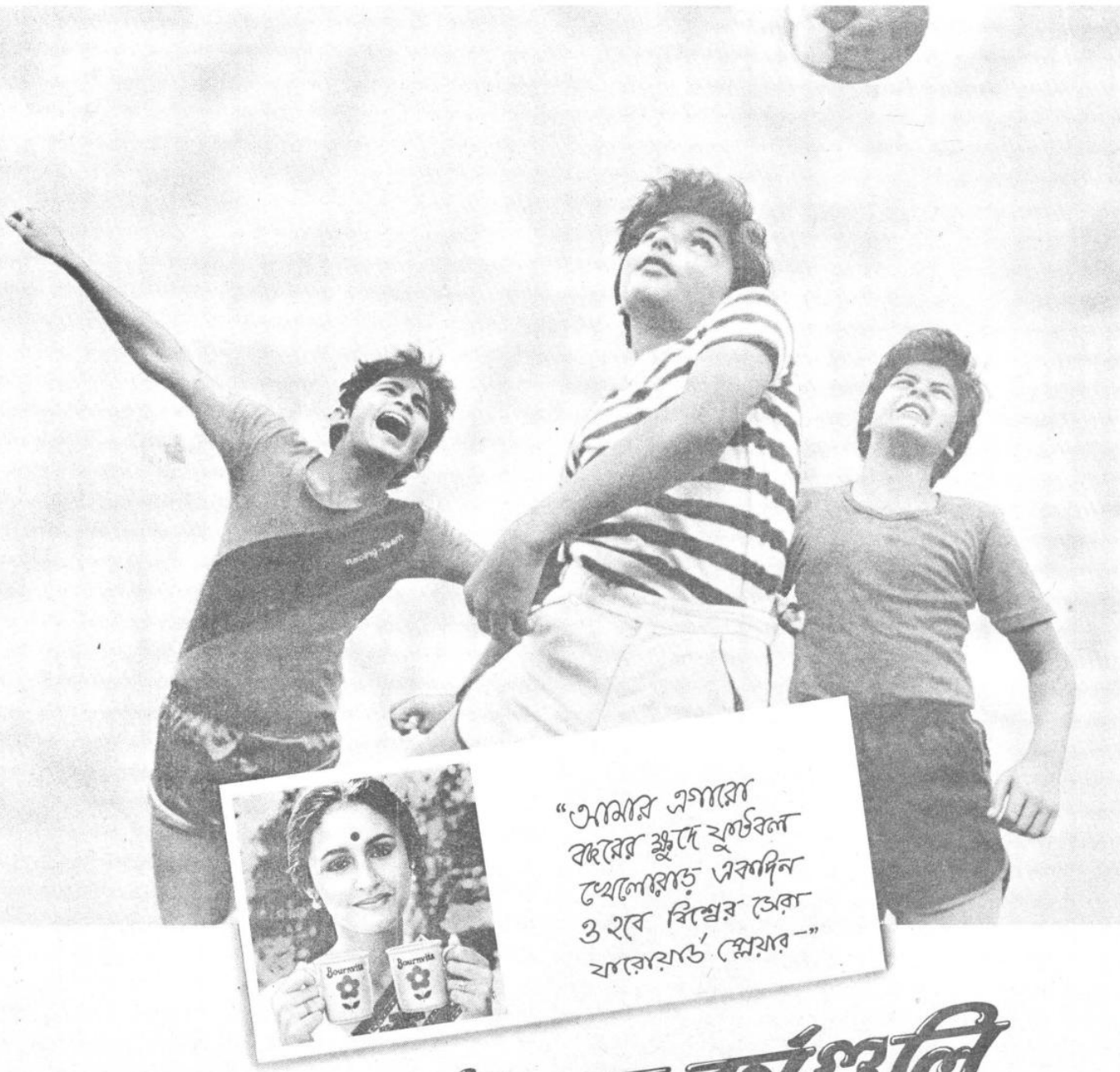

বোর্নভিটাকে ধন্যবাদ

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে? কেন দু'পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন। তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়। এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন,
বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।

OBM/3784 BEN

ধাঁধা

কদিন ধরেই দেখছি, ছোট্কা কেবল ডিকশনারি ঘাঁটছে। একবার এটা নামাচ্ছে, একবার ওটা। কী যে দেখছে, কে জানে !

ছোট্কার ডিকশনারির সংখ্যাও বড় কম নয়। বাংলা অভিধানই পাঁচ-ছটা। ইংরেজি ডিকশনারিও বিস্তর। ছোট বড় মাঝারি মাপের। এ-ছাড়াও আরও নানান ধরনের অভিধান ছোট্কার সংগ্রহে।

এরই মধ্যে দু-চারদিন ধাঁধার জন্য তাগাদা দিয়েছি। ছোট্কা হেসে বলেছে, "ধীরে, সতুবাবু, ধীরে। এই দু-চারটে দিন। তারপরই পেয়ে যাবে।"

পেলাম সত্যিই। কিন্তু একেবারে অন্য ধরনের ধাঁধা। ছোট্কার ভাষায় বলা যায়, ক্যাঙারু-শব্দের ধাঁধা।

আসলে ক্যাঙারু বলতেই যেমন বাচ্চা-কোলে এক প্রাণীর ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এই শব্দগুলোও নাকি তেমনি। বড় শব্দের মধ্যে লুকনো রয়েছে সেই শব্দেরই ছোট একটা প্রতিশব্দ। আর সেই ছোট প্রতিশব্দটাই খুঁজে বার করতে হবে।

ছোট্কা আমাকে উদাহরণ দিয়ে যখন বুঝিয়ে দিল, তখন দেখলাম, ব্যাপারটা সত্যি খুব মজার। যেমন ধরো, DECEASED শব্দটা। মানে হল, মৃত। এই শব্দের মধ্যেই লুকনো রয়েছে DEAD, অবিকল প্রতিশব্দ। আর এই প্রতিশব্দ খুঁজতে মূল শব্দটাকে ওলটপালট করতেও হবে না। পরপর একটু-আধটু শব্দ বাদ দিয়ে গেলেই নাকি প্রতিশব্দ পাওয়া যাবে।

তা, এমন তিনটে শব্দ নীচে দেওয়া হল। এগুলো হল সেই ক্যাঙারু-শব্দ যার মধ্যে কিনা লুকনো রয়েছে তারই ছোট প্রতিশব্দ। সেগুলোকে খুঁজে বার করতে হবে। এটাই হল এবারের **প্রথম ধাঁধা**।

(ক) OBSERVE (খ) CURTAIL (গ) SEPARATE

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ UNITE এই শব্দটাকে এমনভাবে উল্টে-পাল্টে দিতে পারো, যাতে মানেটা উল্টো হবে ? মনে রাখবে, পাঁচটা অক্ষরকেই শুধু নতুন করে সাজানো যাবে, নতুন অক্ষর ঢুকবে না।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ চেনা পাঁচ অক্ষরের ইংরেজি শব্দে একটামাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বা কনসোন্যান্ট, বাকি চারটেই ভাওয়েল ?

গত সংখ্যার উত্তর ॥ (১) আগের বার চিনি মিশিয়েছিলেন ভদ্রলোক। পরের বারের কালো কফি নিশ্চিত চিনি মেশাবার আগেই মিষ্টি লেগেছিল। তাই বুঝলেন, আগের কফিটাই ফের দেওয়া হয়েছে। (২) 'ম' অক্ষরটা। (৩) নাদুসনুদুস।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

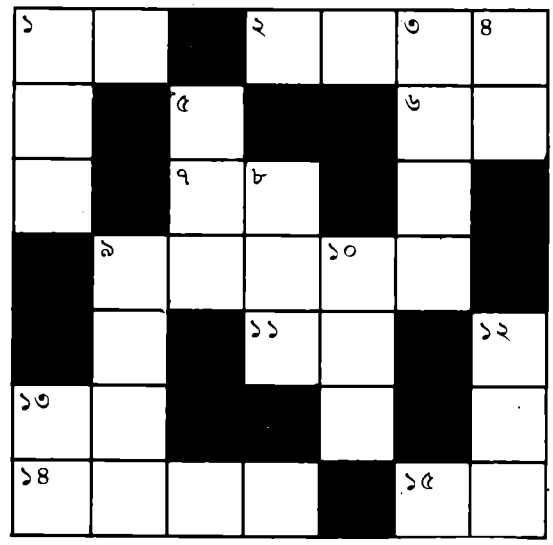

সংকেত : পাশাপাশি : (১) দৈত্যমাতা। (২) পাহাড়ি উপধাতু। (৬) উদ্ধার বা পরিত্রাণ। (৭) লাগাম। (৯) কোনো-কিছুর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ তাপ প্রভৃতি সঞ্চালন। (১১) কোন্ রঙ ভারতীয়দের নামের মধ্যে পাওয়া যায় ? (১৩) কার ভজন বিখ্যাত ? (১৪) ভেট। (১৫) পুরাণমতে সর্পমাতা।

উপর-নীচ : (১) দান করবার ইচ্ছা। (৩) পাগড়ি। (৪) গালা। (৫) কোনো-এক দৈত্যকে বধ করায় শ্রীকৃষ্ণের এই নাম। (৮) যাকে নিয়ে বশিষ্ঠর সঙ্গে বিশ্বমিত্রের বিবাদ বেধেছিল। (৯) কোন্ সে ঘোড়া যা রূপকথায় আছে, বাস্তবে নেই ? (১০) হস্-চিহ্নযুক্ত। (১২) পঞ্চনদের একটি। (১৩) মাছ।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

পু	ষ্প	ক	■	ছ	ত্রা	ক
ষ্যা	■	মা	তু	ল	■	পি
■	ভা	■	ল	■	■	থ্
■	রা	জ	কা	হি	নী	■
শ	■	■	লা	■	ড়	■
শ	■	চা	ম	চ	■	ধ
ক	হ্লা	র	■	র	গ	ড়

মজার খেলা

বারোটা দেশলাইকাঠি মাত্র লাগবে এ-খেলার জন্য। দেশলাইকাঠির বদলে টুথপিক হলেও ক্ষতি নেই। বারোটা কাঠিকে নীচের ছবির মতো করে টেবিলে সাজাও

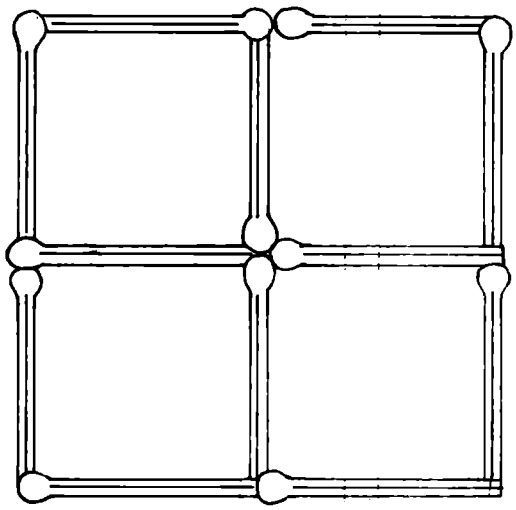

কটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হল বলো তো ? না, চারটে নয়। পাঁচটা। ছোট চারটে এক মাপের, কিন্তু বাইরের আটটা কাঠি দিয়ে যে-বড় বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, সেটাও তো ধরতে হবে।

ব্যস, এবার তুমি তৈরি।

কোনো বন্ধুকে বলো, দুটো কাঠি সরিয়ে ফের এমন ভাবে সে-দুটোকে বসাতে হবে, যাতে কিনা পাঁচটার বদলে মোট ছটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়। সমান মাপের না হলেও চলবে।

দ্যাখো, বন্ধু কী করে।

ব্যাপারটা শুনতে সোজা, হাতে-কলমে করতে হলে একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে।

আর সে-বুদ্ধি যাদের পেটে আসছে মাথায় আসছে না, তাদের জন্য নীচের সমাধানটা দেখানো হল—

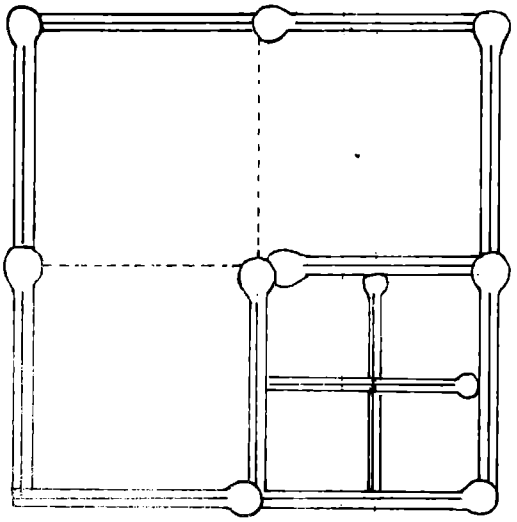

যে-কাঠি দুটো সরে যাবে, ---চিহ্ন দিয়ে দেখানো হল।

মজারু

উত্তর বটে

প্রঃ তিনটে ছাতা নিয়ে বেরুচ্ছেন কেন ?
উঃ দুটো জায়গায় যাবার আছে, সেখানে ভুলে ফেলে আসার জন্যে দুটো, আর সত্যি যদি বৃষ্টি নামে সেজন্যে একটা !

প্রঃ ট্যাক্সির ব্রেক ফেল করেছে স্যার, কী করব শিগগির বলবেন ?
উঃ মিটারটা এক্ষুনি তুলে দাও !

প্রঃ রাত্রিতে আমাদের প্রশ্বাসের সঙ্গে কী গ্যাস নির্গত হয় ?
উঃ Night-rogen স্যার !

সুসেন

হাসিখুশি

"অধিকরণ কারকের একটা উদাহরণ দিতে পারো বাবুয়া ?"

"হ্যাঁ স্যার—'শত্রুপক্ষ দুর্গ অধিকার করেছে'।"

"আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?"

"কী জানি, ঠিক খেয়াল করতে পারছি না।"

"সম্ভবত চিড়িয়াখানায়।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি ছিলেন খাঁচার ভিতরে, আমি ছিলাম বাইরে।"

"টুকাই পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি, তাই তার বাবা তাকে মেরেছেন—এখানে ক্রিয়া কোন্‌টি বলতে পারো বাবুয়া ?"

"পুরোটাই তো প্রতিক্রিয়া স্যার।"

"মাছের দোকানে আমাকে একটা অচল সিকি দিয়েছে। আজকাল মানুষ এত অসৎ !"

"কোথায় দেখি সিকিটা, চালাতে পারি কি না।"

"ওটা আমি মুদির দোকানে চালিয়ে দিয়েছি।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

এয়ার-লক পরিষ্কার। টারজানের সঙ্কেত পেয়ে ম্যাক রে দরজা খুলে দিলেন···

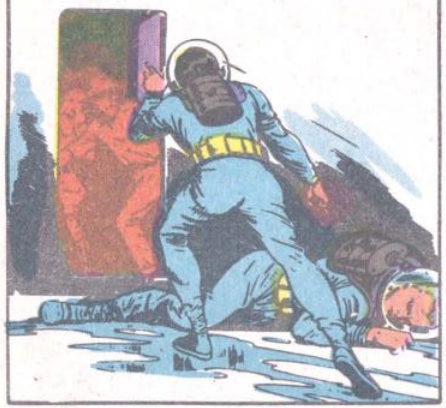

ডোনার ধারণা ট্রাভিস মারা গেছে! ম্যাক রে বললেন, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে মাত্র।

সুস্থ হয়ে উঠেছে ট্রাভিস। সবাই খুশি। টারজানের মুখেও হাসি ফুটেছে।

ম্যাক রে বললেন, "পরশু নাগাদ আমরা মুয়া-আও দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছব।"

"মানচিত্রে তো অমন কোনো দ্বীপপুঞ্জ নেই" টারজানের এই মন্তব্যের উত্তরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ম্যাক রে বললেন, "তা না-ই থাক, কিন্তু ওই দ্বীপপুঞ্জ আছে।"··

কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ দেখা দিল দুই পালের একটি জাহাজ। ডুবোজাহাজের দিকে সে এগিয়ে আসতে লাগল···

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

উয়েফা কাপের ফিরতি খেলা হেকলাভিকের সঙ্গে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে রয়-সমেত রোভার্সের অনেকেই অসুস্থ। হেকলাভিকের গোলকিপার এদিকে দারুণ খেলছে !
ডানকান ম্যাকের ভলি আটকে দিয়েছে !
বারে লেগে বল মাঠে ফিরছে !

ফিরতি বলে শট নিয়েছে ডিকসন !
এবারে গোল হবেই !

কিন্তু
পাঠেকিয়ে বাঁচাল !
ভাবা যায় ?

গোলিকে সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে !
শাবাশ !
টরফারসন !

কর্নার কিকের পর · · ·
বল গেছে ড্যাগসনের কাছে ! বিপদ ঘটাতে পারে !
হুম্ ! ঠিক বলেছ !

লেন পিটার্স আর জিমি ক্লেডকে এইজন্যেই ওর উপরে নজর রাখতে বলেছিলাম !
আটকাও জিমি !

জিমিকে কাটিয়েছে ড্যাগসন · কিন্তু ·
উঃ !
লেন্ ওকে আটকে দিয়েছে ! রোভার্স এগোচ্ছে।

কিন্তু এবারেও ঝাঁপিয়ে পড়ে গোল বাঁচাল টরফারসন
রোভার্সের সমর্থকদের অনেকেই আইসল্যাণ্ডে এসেছে খেলা দেখতে · · · হাফ-টাইমে তাঁরা খুশি · · ·
চালিয়ে যাও রোভার্স !
হেকলাভিককে হারাতেই হবে !
রয় কিন্তু খুশি নয় · · ·
ড্র হলে আমরা হারব । তার কারণ, বিদেশে জিতে ওরা বেশি পয়েণ্টে এগিয়ে আছে !
তাই তো । কী করা যায় ?
যে-করেই হোক, গোল করতে হবে !
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা চলছে · · ·
গোটা দল ডিফেন্সে খেলছে !
তাহলে গোল করব কীভাবে ?
রোভার্সের তরুণ খেলোয়াড় টেরি কিলান দারুণ খেলছে · · কিন্তু
আঃ !
ডিফেন্স একেবারে দুর্ভেদ্য !
এভাবে হবে না ।
এই সময়
রয় তাহলে নামবে !
রয় !
রোজার ডিকসনের জায়গায় রয় নেমেছে !
দুয়ো !
তুমি নেমেও সুবিধে করতে পারবে না হে !
ওরা কি জানে যে, আমি অসুস্থ !
রেফারি রয়ের নম্বর লিখে নিলেন · · ·
গোলের জন্য শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখব !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)
কিন্তু গোল কি হবে ?

সংসারে অনেক দেখেশুনে কাজ করাতে হয় ভাই... সেই জন্যে এ বছর দেয়ালে ট্র্যাক্টর লাগিয়েছি!"

"আমার 'উনি' আবার একটু নতুন ধরণের মানুষ তো—পাড়ার মধ্যে সবপ্রথম আমাদের বাড়ীতেই রেডিও এসেছিল··· ভাবলাম এবার দেয়ালে আবার সেই আদ্যিকালের পাউডার ডিস্টেম্পার লাগাবো কেন? এবার ট্র্যাক্টর ডিস্টেম্পার লাগিয়েছি··· দারুণ দেখাচ্ছে!"

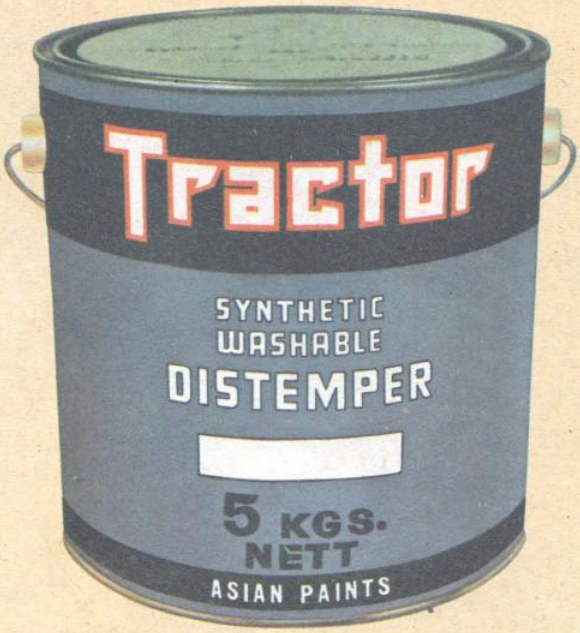

"দেখতে দারুণ সুন্দর হয়, আর রীতিমত সাশ্রয়!
যাকে বলে সর্বদিক থেকে লাভের সওদা।
এবার আপনি নিজেই ব্যবহার করে দেখুন:"

ট্র্যাক্টর সিন্থেটিক ওয়াশেব্‌ল্ ডিস্টেম্পার

১. লাগানোর কাজ পরিচ্ছন্ন আর সহজ হয়, কারণ ফ্যাক্টরী থেকে তৈরী পাওয়া যায়, কোনো দুর্গন্ধও নেই।
২. চমৎকার মখমলী ফিনিশ, অসমান দাগ পড়ে না, সমান রঙ হয়।
৩. চটপট শুকোয়, ঝটপট তুলির কাজ সারা যায়।
৪. দাগ-ছোপ ভিজে কাপড় দিয়ে মুছলেই একেবারে সাফ!
৫. ঘেঁষে বসলেও রঙ ঝরে কাপড়ে লাগে না।
৬. বহু রকমের রঙ—স্টেনার মিশিয়ে হাজার রকমের রঙ তৈরী হয়।
৭. বেশী টেঁকে—বহু বছর নতুনের মত থাকে।
৮. দাম সামান্য বেশী, তবে বেশী দিন টেঁকে বলে শেষ পর্যন্ত সাশ্রয় হয়।

সাধারণ পাউডার ডিস্টেম্পার

১. লাগানোর কাজ অপরিচ্ছন্ন, আর সহজ নয়, কারণ নিজে মেশাতে হয়।
২. বাজে খরখরে ফিনিশ, দেয়ালে ব্রাশের দাগ—রঙ কোথাও বেশী কোথাও কম, উঠে গিয়ে দেয়ালের রঙ বিগড়ে দেয়।
৩. দেরীতে শুকোয়, তুলির কাজ সারতে অনেক সময় নষ্ট হয়।
৪. দাগ-ছোপ সাফ করা যায় না।
৫. রঙ ঝরে উঠে গিয়ে কাপড়ে লাগে।
৬. অল্প রঙ, স্টেনার মিশিয়ে মনের মত রঙ বানিয়ে নেবার সুবিধে নেই।
৭. কিছু মাসের মধ্যেই ফিকে আর ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যায়।
৮. দাম কম, তবে কম টেঁকে বলে শেষ পর্যন্ত ব্যয়বহুল।

এবার নতুন ঢং, নতুন রঙ ব্যবহার করুন, ট্র্যাক্টর লাগিয়ে দেয়াল সুন্দর করে তুলুন!

ট্র্যাক্টর

বহু বছর ধরে কোটি কোটি লোক ব্যবহার করে আসছেন।
ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ডিস্টেম্পার।

এশিয়ান পেন্টস্

Adroit-130/ Ben. R

পোড়ো খনির প্রেতিনী

[শেষাংশ]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

॥ চার ॥

রাতে ভাল ঘুম হয়নি। পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত করে মর্গে লাশ চালান দিয়েছিল। পুলিশের হাবভাবে বুঝেছিলাম, দায়সারা করে চোর-ডাকাতের ওপরই ব্যাপারটা চাপাতে চায়। কর্ণেলকে মোটেও পাত্তা দেয়নি পুলিশ। সকালে দশরথ চা এনে যখন আমার ঘুম ভাঙাল, তখন আটটা বেজে গেছে। উঠে দেখলুম, কর্ণেল নেই। দশরথ বলল, "কর্নিলস্যার সুবেসে বেরিয়েছেন। কুছু বোলেননি।"

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। জিজ্ঞেস করলে বললেন, "মর্গে গিয়েছিলুম। মর্গের ডাক্তারের মতে, পাশুজি আর মিছিরজির মতো কেউ রুদ্রবাবুর মুণ্ডু কাটার চেষ্টা করেছিল।"

বললুম, "রুদ্রবাবু মৃত্যুর আগে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেছেন, কর্নেল। ব্যাপারটা রহস্যময় নয় ?"

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন, "তা তো বটেই ! তবে পুলিশ বলছে, খুনি রুদ্রবাবুর পরিচিত লোক। আর খুনের উদ্দেশ্য হল ছিনতাই।"

অবাক হয়ে বললুম, "ছিনতাই ! উনি কি ওই মাঠে টাকাকড়ি নিয়ে বসে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। কারণ আজ ভোরে পুলিশ ইন্সপেক্টর পরমজিৎ সিং পোড়োখনির ওখানে কোথায় রক্তমাখা একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল কুড়িয়ে পেয়েছেন। ছিনতাই করে পালাবার সময় খুনির হাত থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে।"

"অত টাকা নিয়ে ওখানে কী করছিলেন রুদ্রবাবু ? পেলেনই বা কোথায় অত টাকা ?"

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, "এমনও তো হতে পারে, খুনিরই টাকা ওগুলো। অর্থাৎ রুদ্রবাবু সেই দলিলটা চুরি করে তাকেই বেচতে গিয়েছিলেন। দলিল হাতিয়ে এবং টাকা মিটিয়ে হঠাৎ খুনি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়েছিল। রুদ্রবাবু আহত অবস্থায় কোনোরকমে পালিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু টাকার বাণ্ডিলটা পড়ে যায়।"

"তাও হতে পারে বৈকি।"

কর্নেল কিছুক্ষণ গুম হয়ে সাদা দাড়ি টানতে শুরু করলেন। বুঝলুম, সূত্র হাতড়াচ্ছেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এসো জয়ন্ত, আমরা একবার পাণ্ডেজির গদি থেকে ঘুরে আসি।"

রাস্তায় যেতে যেতে বললুম, "কিন্তু একটা রহস্য কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। রুদ্রবাবুর পিছন পিছন চুরাইল বা শাঁখচুন্নিটাও ছুটে এসেছিল। তার চিৎকার আমরা শুনতে পেয়েছিলুম। এখন কথা হল···"

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আরও জট পাকিয়ে যাবে, ডার্লিং! এখন সবচেয়ে দরকারি কাজ হল মাথা ঠাণ্ডা রাখা। চুরাইল-রহস্য নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত শুধু হত্যাকাণ্ডের দিকে লক্ষ রেখে এগোতে চাই।"

ভিড়ে ভরা বাজার এলাকা ছাড়িয়ে আমরা স্টেশনে পৌঁছলুম। পাণ্ডেজির গদি স্টেশনের ওধারে। ওদিকটায় চুন-সুরকির আড়ত, কাঠগোলা, ছোট কলকারখানা। আর কিছু চা-সিগারেটের দোকান আছে। একখানে প্রকাণ্ড তরাজুতে খন্দের বস্তা বোঝাই হচ্ছে। কর্নেলকে দেখতে পেয়ে একজন ফর্সা সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোক উঁচু তক্তপোশ থেকে নেমে এসে নমস্কার করলেন। কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন, পাণ্ডেজির জামাই মোহনবাবু। মোহনবাবু পরিষ্কার বাংলা বলেন। খুব খাতির করে বসালেন। চা-সন্দেশ এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কর্নেল বললেন, "মোহনজি, আপনাকে পুরনো খাতাপত্র দেখতে বলেছিলুম গতকাল। দেখেছেন কি?"

মোহনজি পেছনের তাক থেকে একটা প্রকাণ্ড পুরনো খাতা নামিয়ে বললেন, "দেখেছি কর্নেল। শ্বশুরমশাই নিজে এই খাতাটা লিখতেন। এটা ওঁর মহাজনী কারবারের খাতা। এই দেখুন, এই পাঁচজন খাতকের নাম আমি খুঁজে বের করেছি। এঁদের প্রত্যেকেই মোটা টাকা ধার নিয়েছিলেন। এখনও কারুর কারুর বাকি আছে।"

খাতার ভেতর থেকে একটা চিরকুট বের করে দিলেন মোহনজি। কর্নেল সেটা দেখতে থাকলেন। উঁকি মেরে দেখলুম, নামগুলো ইংরিজিতে লেখা। সাত নম্বর নামটা দেখে চমকে উঠলুম। রুদ্রনারায়ণ দেব—তিন হাজার টাকা। সুদের হার শতকরা মাসে তিরিশ টাকা। পুরোটাই বাকি।

কর্নেল বললেন, "হ্যাণ্ডনোটগুলো পেয়েছেন মোহনজি?"

মোহনবাবু বললেন, "হ্যাঁ। ছখানা পেয়েছি। একখানা পাইনি। মনে পড়ছে, ওই হ্যাণ্ডনোটখানার জন্য শ্বশুরমশাই মিছিরজিকে খুব বকাবকি করছিলেন। মিছিরজিকে উনি খুব বিশ্বাস করতেন তো! আলমারির চাবি অনেক সময় মিছিরজির কাছেও থাকত।"

কর্নেলের চোখদুটো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বললেন, "কবে

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"—

ফেভি ফেয়ারী

চট্‌পট্ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল **এম-আর** ।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে যাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক ।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা-হাতি-বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল **এম-আর** ।

ওলি প্যাঁচা কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে,
সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি
পাঠান বা এই/ঠিকানায় লিখুন : "ফেভি ফেয়ারী",
পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

ওলি প্যাঁচা কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে
বিনামূল্যে তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান :
"ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম: ______________________

বয়স : ______________________

ঠিকানা : ______________________

সহর : ______________________

রাজ্য : ____________ পিনকোড : ____________

আপনি কি আমাদের ফেভিক্রাফট্ পত্রিকাটি পেয়েছেন ? হ্যাঁ/না

(A)

এম-আর
ফেভিকল
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® Both ® and FEVICOL brand are
Registered Trade Marks of PIDILITE INDUSTRIES PVT. LTD. Bombay 400 021

OBM/3402 BN

বকাবকি করছিলেন মনে আছে ?"

"এই তো—যে-রাতে শ্বশুরমশাই খুন হলেন, তার আগের দিন।"

"মিছিরজি খুন হন তার পরের রাতে। তাই না ?"

"হ্যাঁ।" মোহনবাবু একটু অবাক হলেন যেন। বললেন, "আপনি কি মনে করছেন হ্যাণ্ডনোট হারানোর সঙ্গে ওঁদের খুন হওয়ার সম্পর্ক আছে ?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।"

মোহনবাবুকে উত্তেজিত দেখাল। "কিন্তু আমিও যে সে-রাতে চুরাইলের ডাক শুনেছিলাম, কর্নেল ! কাল রাতে যদুবাবুর ভাইয়ের বেলাতেও শুনলুম নাকি চুরাইল ডেকেছিল !"

"হ্যাঁ। ডেকেছিল। আমিও শুনেছি।"

মোহনবাবু আরও উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বললেন, "তাছাড়া শ্বশুরমশাইয়ের ডেডবডিতে যেমন, তেমনি মিছিরজির ডেডবডিতেও একফোঁটা রক্ত ছিল না। মর্গের রিপোর্টেও সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি স্থানীয় বুড়োবুড়িদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, চুরাইল নাকি মানুষের মুণ্ডু ছিঁড়ে গলা থেকে রক্ত চুষে খায়। রুদ্রবাবুর বেলায় অবশ্য মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্তচোষার সুযোগ পায়নি শুনেছি। তবে গলায় নখ বসিয়ে মুণ্ডু ছিঁড়তে চেষ্টা করেছিল। তাই কিনা বলুন ?"

কর্নেল আস্তে বললেন, "ও নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এবার বলুন, এই তালিকার কোন্ খাতকের হ্যাণ্ডনোট পাওয়া যায়নি।"

মোহনবাবু তালিকার একটা নামে ডটপেনের চিহ্ন দিয়ে বললেন, "এঁর। কিন্তু সমস্যা হল, ইনি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন বছর-দশেক আগে। সুদে-আসলে এখন দাঁড়িয়েছে···মাই গুডনেস ! হিসেবে ভুল হয়নি তো ?"

কর্নেল দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "না। মাসেই যদি শতকরা তিরিশ টাকা সুদ হয়, তাহলে একমাসে পাঁচ হাজার টাকার সুদ হবে পনেরশো টাকা। বছরে আঠারো হাজার টাকা। দশ বছরে দাঁড়াবে একলক্ষ আশি হাজার টাকা। সুদসহ ১,৮৫,০০০ টাকা। সহজ হিসেব।"

মোহনবাবু হতাশ মুখে হাসলেন। "কিন্তু খাতক ভদ্রলোকই তো সেই থেকে নিরুদ্দেশ।"

আমার মাথায় গত রাতে যদুবাবুর কাছে শোনা একটা নাম ঝিলিক দিল। বলে ফেললুম, "সেই খনিমালিক নন্দবাবুর পিসতুতো না মাসতুতো দাদা পান্নাবাবু নন তো ?"

মোহনবাবু বললেন, "ঠিক, ঠিক। পান্নালাল ওঝা। আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। কারণ আমার বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক আগে। তাছাড়া থাকতুম ধানবাদে। গত বছর শ্বশুরমশাইয়ের অনুরোধে ওঁর ব্যবসার দেখাশুনা করতে এসেছি।"

ওপাশে একজন বৃদ্ধ কর্মচারী খাতা লিখতে-লিখতে আমাদের কথা শুনছিলেন। বললেন, "পান্নাবাবুর কনট্রাকটারি কারবার ছিল। লেবার সাপ্লাই করতেন। সেবার কারবারে লস খেয়ে বিপদে পড়েছিলেন। পাওনাদার সেদিন ওঁকে পাঁচ হাজার টাকা না দিলে লেবাররা ওঁকে মেরে ফেলত। মজুরি মেটাতে পারছিলেন না।"

কর্নেল বললেন, "পান্নাবাবুর চেহারা কেমন ছিল ?"

বৃদ্ধ কর্মচারীটি বাঙালি। বললেন, "রোগা, ঢ্যাঙামতো। রঙটা বেশ ফর্সা। চোখ দুটো ছিল কয়রা—যাকে বলে বেড়ালচোখো।"

কর্নেল মোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "পাণ্ডেজি টাকা আদায়ের জন্য মামলা করেননি ?"

সেই বাঙালি কর্মচারী ভদ্রলোক বললেন, "জামাইবাবু জানেন না। মামলা করেছিলেন পাণ্ডেজি। দেওয়ানি মামলা, তাতে অন্যপক্ষ গরহাজির। শেষে পাণ্ডেজি প্রতারণার মামলা করেছিলেন। পান্নাবাবুর নামে হুলিয়া জারি হয়েছিল। কিন্তু ওঁকে পুলিশ খুঁজে পায়নি।"

মোহনবাবু বললেন, "আশ্চর্য, শ্বশুরমশাই এ-কথাটা তো বলেননি !"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলি মোহনজি ! দরকার হলে আবার আসব।"

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে কর্নেল বললেন, "এসো তো জয়ন্ত, আমরা রেললাইন ধরে পোড়োখনি এলাকায় যাই। দিনদুপুরে আশা করি চুরাইলটার আবির্ভাব ঘটবে না।"

পোড়োখনির উত্তর-পূর্বে জঙ্গল আর টিলার ভেতর দিয়ে রেললাইনটা ঘুরে গেছে ধানবাদের দিকে। কিছুক্ষণ পরে আমরা রেললাইন থেকে নেমে একটা টিলার পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকলুম। এদিকটায় অজস্র খানাখন্দ, বড়-বড় পাথর, লালমাটির ঢিবি আর ঝোপঝাড়। এক জায়গায় গিয়ে কর্নেল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বললাম, "কী ?"

কর্নেলকে উত্তেজিত মনে হল। চাপা গলায় বললেন, "আরে ! সাধুবাবা যে !"

চমকে উঠে বললুম, "কই, কই ?"

কর্নেল আচমকা হ্যাঁচকা টানে আমাকে বসিয়ে দিলেন এবং নিজেও বসলেন। ফিসফিস করে বললেন, "এসো, আমরা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাই। সাবধান, যেন সাধুবাবা দেখতে না পায়।"

সাধুবাবাকে আমি দেখতে পাইনি। কর্নেলের পেছনে-পেছনে ছোটবড় পাথর, ঝোপঝাড় আর ঢিবির আড়ালে অন্ধের মতো প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। প্রকাণ্ড একটা পাথর দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাথরটার একপাশে ঘন ঝোপঝাড়। সেখানে হাঁটু দুমড়ে বসে কর্নেল ঝোপের ভেতর উঁকি দিলেন। দেখাদেখি আমিও উঁকি দিলুম। একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

লাল-কাপড়-পরা সেই সাধুবাবা যেন পিঙ্কির কুকুর কুকির সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। কিন্তু ধারেকাছে কোথাও পিঙ্কি নেই।

পিঙ্কি নেই। অথচ কুকি আছে। ব্যাপারটা আমার গোলমেলে মনে হল। কিন্তু ও কি সত্যি লুকোচুরি খেলা ? কুকি পাথরের আড়ালে লুকোতেই সাধুবাবা একটুকরো পাথর তুলে ছুড়ে মারলেন। কুকি আবার আরেকটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল। সাধুবাবার মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠলুম। রাগে খেপে গেছেন যেন। আবার পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারলেন। অল্পের জন্য কুকি বেঁচে গেল। এবার সে আমাদের দিকে দৌড়তে শুরু করল। সাধুবাবা তাড়া করে আসতেই একটা খাদে আছাড় খেয়ে পড়লেন। খাদটা গভীর বলে মনে হল। ততক্ষণে কুকি যেন আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে। সে সোজা এসে ঝোপে ঢুকল। কর্নেল মৃদু শিস দিলেন। কুকি থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণে দেখলুম, তার মুখে একটা ছোট্ট হ্যাণ্ডব্যাগ রয়েছে। কর্নেল আবার শিস দিলে সে কাছে চলে এল। কর্নেল তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখের হ্যাণ্ডব্যাগটা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, "শিগগির জয়ন্ত ! সাধুবাবাকে এখনই ধরে ফেলতে হবে !"

ঝোপ থেকে বেরিয়ে গেলুম। কর্নেল আমার পিছনে। তাঁর কোলে কুকি। সাধুবাবা এতক্ষণে গর্ত থেকে উঠেছেন। কিন্তু আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। আমি রিভলভার বের করে চেঁচিয়ে বললুম, "খবর্দার সাধুবাবা ! পালাবার চেষ্টা করলে গুলি ছুড়ব।"

সাধুবাবা অমনি দৌড়ে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। আমিও দৌড়লুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে আর তাঁর পাত্তা পেলুম না। আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করে হন্যে হয়ে কর্নেলকে ডাকলুম। একটু তফাতে কর্নেল কোনো অদৃশ্য জায়গা থেকে সাড়া দিয়ে বললেন, "এখানে চলে এসো জয়ন্ত !"

অবাক হয়ে বললুম, "কোথায় আপনি ?"

একটা পোড়োখনির মুখই হবে। বিরাট গর্ত। সেই গর্তে কি কর্নেল সাধুবাবার মতো পা হড়কে পড়ে গেছেন ? কাছে গিয়ে দেখি, আরও অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে। গর্তের ভেতর বেচারি পিঙ্কির মুখ একটুকরো লাল কাপড়ে বাঁধা। দু'হাত এবং পা-দুটো লতা দিয়ে বাঁধা। কুকি তার দিকে যেন অবাক চোখে তাকিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল তার বাঁধন কেটে দিচ্ছেন ছুরি দিয়ে।

কর্নেল বললেন, "আমরা না এসে পড়লে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত, ভেবে শিউরে উঠছি জয়ন্ত !"

পিঙ্কি কিন্তু মোটেও ঘাবড়ে যায়নি। দিব্যি উঠে দাঁড়াল। তারপর কুকিকে কোলে নিয়ে দুবার তার গালে চড় মারল। "আর যদি কখনও গুহায় ঢুকিস, তোকে মেরে ফেলব বলে দিচ্ছি !"

কর্নেল তাকে ওপরে তুলে ধরলেন। আমি টেনে নিলুম। তারপর কর্নেলকেও উঠতে সাহায্য করলুম। কর্নেল পিঙ্কির কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমাকে সাধুবাবা কেন বেঁধে রেখেছিল, পিঙ্কি ?"

পিঙ্কি বলল, "কুকি সাধুবাবার ব্যাগ নিয়ে এসেছিল গুহার ভেতর থেকে। সাধুবাবা ওর পেছন-পেছন এসে আমাকে বলল, পিঙ্কি, তোর কুকুর আমার ব্যাগ চুরি করেছে।" পিঙ্কি হাসতে লাগল। আমি বললুম, সাধুবাবা ! তুমি পারো তো ওর কাছে চেয়ে নাও। তখন সাধুবাবা রেগে গেল। গিয়ে চোখ কটমট করে বলল, তোকে চুরাইল দিয়ে খাওয়াব। তারপর আমার মুখ বেঁধে দিল।"

"তুমি বাধা দাওনি ?"

পিঙ্কি খিলখিল করে হাসল। "কেন ? সাধুবাবার সঙ্গে আমার খুব ভাব যে ! রোজ দেখা হয়। কত গল্প বলে। আমার সঙ্গে তো জোক করেছে সাধুবাবা !"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "জোক নয়, পিঙ্কি ! সাধুবাবা তোমাকে সত্যি চুরাইলের সামনে ঠেলে দিত। আর কখনো সাধুবাবার কাছে এসো না।"

পিঙ্কি মুখে অবিশ্বাস ফুটিয়ে বলল, "যাঃ !"

কর্নেল বললেন, "সাধুবাবা কোন্ গুহায় থাকেন তুমি জানো ?"

পিঙ্কি মাথা দুলিয়ে বলল, "হুঁউ ।" বলে সে চেঁচিয়ে ডাকল "সাধুবাবা ! সাধুবাবা ! কোথায় তুমি ?"

অমনি আমাদের সামনে একটা পাথর এসে পড়ল । কর্নেল বললেন, "শিগগির এখান থেকে কেটে পড়াই ভাল, জয়ন্ত ! পিঙ্কি, চলো ! সাধুবাবা পাথর ছুড়তে শুরু করেছে ।"

পিঙ্কিকে টানতে টানতে কর্নেল দৌড়লেন । কুকি তার কোল থেকে লাফিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করছিল । কিন্তু পিঙ্কি কুকিকে ছাড়ল না । এদিকে দুমদাম করে পাথর এসে পড়ছে একটা ঢিবির আড়াল থেকে । ফাঁকা মোটামুটি সমতল একটা জায়গায় পৌঁছে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে এবার পিঙ্কিদের বাড়ির পথ ধরলুম । কর্নেল বললেন, "পিঙ্কি, ওবেলা তোমাকে নিয়ে আসব । তখন সাধুবাবার গুহাটা দেখিয়ে দেবো । এখন সাধুবাবা বড় চটে গেছে ।" পিঙ্কি মাথা দুলিয়ে সায় দিল···

॥ পাঁচ ॥

সাধুবাবার হ্যাণ্ডব্যাগটার দশা জরাজীর্ণ । খুলতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ । প্রথমে বেরুল নন্দবাবুর সেই পোড়োখনি বিক্রির আনরেজিস্টার্ড দলিল । দলিলে রক্তের ছোপ লেগে আছে । কাল রাতে, রুদ্রবাবুর কাছ থেকে এটা নেওয়া হয়েছিল ।

তারপর বেরুল পাণ্ডেজির হারানো হ্যাণ্ডনোট । পান্নালাল ওঝার সই করা । পাঁচ হাজার টাকা কর্জ নিচ্ছেন পান্নাবাবু শতকরা মাসিক তিরিশ টাকা সুদে । আর বেরুল কিছু কাগজপত্র ।

বললুম, "তাহলে পোড়োখনির সাধুবাবাই দেখছি পান্নালাল ওঝা ।"

কর্নেল বললেন, "আবার কে ? দেনা আর প্রতারণার মামলায় ফেরার হয়ে পান্নালাল পোড়োখনির ভেতর কোনো গুহায় আত্মগোপন করেছিল আমার ধারণা ..."

কথায় বাধা পড়ল । যদুবাবু আর মোহনজি এলেন । মোহনজি ঘরে ঢুকে বললেন, "শ্বশুরমশাইয়ের একটা নোটবইয়ের ভেতর এই চিঠিটা হঠাৎ পেয়ে গেলুম । চিঠিটা পড়ে মনে হল, এটা একটা ক্লু হতে পারে । দেখুন তো কর্নেল ।"

কর্নেল চিঠিটা পড়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক । এমনটি অনুমান করেছিলুম । চিঠিতে পান্নাবাবু ইংরেজিতে লিখেছেন, ৫ মার্চ রাত বারোটা নাগাদ স্টেশনে পাণ্ডেজি গেলে পান্নাবাবু তাঁকে দলিলটা দেবেন ।"

যদুবাবু চমকে উঠে বললেন, "কিসের দলিল ?"

"নন্দবাবুর দলিল । অথচ আমরা জানি, তখনও দলিল আপনার মায়ের আলমারিতে ছিল । মাত্র গতকাল সেটা রুদ্রবাবু চুরি করেছিলেন । তার মানে দাঁড়াচ্ছে, পাণ্ডেজিকে মিথ্যা লোভ দেখিয়ে অত রাতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন পান্নাবাবু । উদ্দেশ্য হল, তাঁকে খুন করা ।"

মোহনজি মৃদু স্বরে বললেন, "কিসের দলিল ?"

কর্নেল বললেন, "যদুবাবুর কাছে শুনবেন । তবে বোঝা যাচ্ছে, পাণ্ডেজিরও দলিলটার ওপর লোভ ছিল । প্রচণ্ড

লোভই বলব । নইলে অত রাতে বাড়ি ছেড়ে যাবেন কেন ? তাছাড়া দলিলের বদলে নিশ্চয় পান্নাবাবু কিছু দাবি করেছিলেন । কী দাবি হতে পারে সেটা ? নিশ্চয় কর্জ শোধ । এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকার বদলে ওই দলিলটা খুব দামি মনে হয়েছিল পাণ্ডেজির কাছে । কেন, বুঝতে পারছ কি জয়ন্ত ?"

আমি কিছু বলার আগেই যদুবাবু বলে উঠলেন, "পোড়োখনির ঠিকানা দলিলেই ছিল । দেখা যাচ্ছে, পাণ্ডেজিও জানতে পেরেছিলেন, নন্দবাবুর ওই পোড়োখনির ভেতর বহুমূল্য কিছু জিনিস আছে । ভারী আশ্চর্য তো !"

কর্নেল বললেন, "মিছিরজিকে দিয়ে পান্নাবাবুই হ্যাণ্ডনোটটা চুরি করিয়েছিলেন বোঝা যায় । ওটা না থাকলে পাণ্ডেজি বা তাঁর জামাই কেউই পান্নাবাবুর কাছে আইনত টাকা দাবি করতে পারছেন না । পান্নালাল ওঝা অতি ধূর্ত লোক দেখা যাচ্ছে ।"

মোহনজি বললেন, "কিন্তু মিছিরজিকে কেন খুন করবেন পান্নাবাবু ।"

"যে উদ্দেশ্যে রুদ্রবাবুকে খুন করেছেন, সেই উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ জিনিস হাতিয়ে নিয়েছেন যে টাকা দিয়ে, সেই টাকা আবার পান্নাবাবুর পকেটে ফিরে আসতে পারে—যদি ওঁদের তিনি খুন করেন । নির্বোধ মিছিরজি টাকার লোভে পান্নাবাবুকে হ্যাণ্ডনোট ফেরত দিতে গেলেন । টাকাও পেলেন । কিন্তু তাঁকে খুন করে সেই টাকাগুলো কেড়ে নিলেন পান্নাবাবু । রুদ্রবাবুর বেলাতেও একই ব্যাপার ।"

বলে কর্নেল একটু হাসলেন । "যদুবাবু, আপনাদের হারানো দলিল আমার হাতে ফিরে এসেছে ।"

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

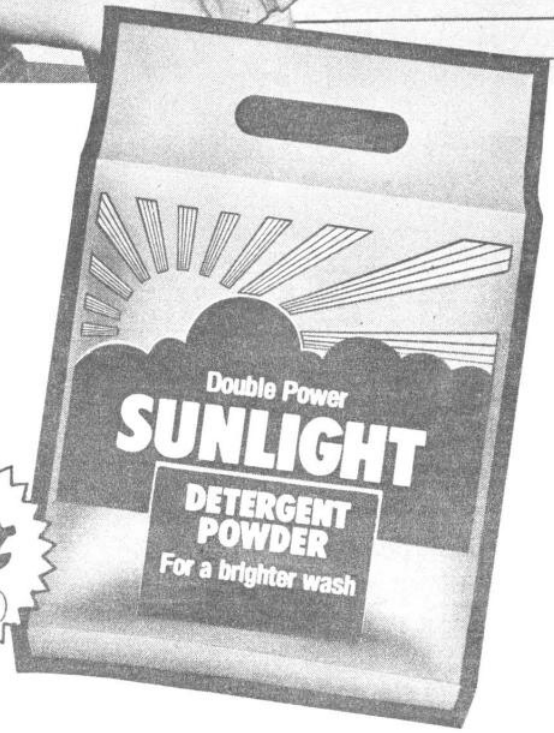

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2668 BEN

যদুবাবু লাফিয়ে উঠলেন। "বলেন কী! কোথায় পেলেন?"

"সময়ে জানতে পারবেন। তবে একটা কথা, আপনার মেয়ে পিঙ্কির কি স্কুলের ছুটি আজ?"

"না তো। বাড়িতে অমন একটা ঘটনা ঘটল, তাই ওকে স্কুল যেতে দিইনি। কেন?"

"পিঙ্কি যেন একা কোনোভাবে বাড়ির বাইরে না যেতে পারে। খুব সাবধান। বিকেলে আমি একবার অবশ্য ওকে নিয়ে বেরুব। কিন্তু একা যেন ও না বেরোয়।"

যদুবাবু উদ্বিগ্নমুখে বললেন, "ঠিক আছে, কিন্তু কেন?"

কর্নেল হাসলেন। "বললুম তো। সময়ে সবই জানতে পারবেন।"

মোহনজি বললেন, "সবই ধাঁধা থেকে গেল, কর্নেল। আপনি বলছেন, পান্নাবাবুই খুনি। কিন্তু ওরকম বীভৎসভাবে খুন—মুণ্ডু কাটা এবং রক্তহীন বডি। আর ওই ভয়ঙ্কর চিৎকার।"

যদুবাবু বললেন, "ঠিক ঠিক। চুরাইলের ব্যাপারটা তাহলে কী?"

কর্নেল হাই তুলে বললেন, "আশা করি, আজ রাতেই চুরাইলের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।"

যদুবাবু ও মোহনজি বেরিয়ে গেলেন। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে বারোটা বাজে প্রায়। কর্নেল আরামকেদারায় চিত হয়ে চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন।

একটু পরে বললুম, "আচ্ছা কর্নেল, নন্দবাবুর পোড়োখনির ঠিকানা তো পাওয়া গেছে। ওর ভেতর যদি সত্যি গুপ্তধন থাকে, তাহলে যদুবাবুই তো তার মালিক হবেন?"

কর্নেল চোখ বুজে ছিলেন। চোখ খুলে বললেন, "না জয়ন্ত! তুমি ভাবছ, ওখানে সোনাদানা হিরে-জহরত লুকনো আছে। সাধুবাবা ওরফে পান্নাবাবুর হ্যাণ্ডব্যাগে বিদেশের এক কোম্পানির লেখা একটা চিঠি আছে। একপলক চোখ বুলিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। পান্নাবাবু গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল করে বেড়াচ্ছিলেন। না—সোনাদানা লুকনো নেই। ওটা আসলে একটা ইউরেনিয়ামের খনি। পান্নাবাবু ওই বিদেশী কোম্পানিকে গোপনে ইউরেনিয়াম বেচতে চেয়েছিলেন। কোম্পানি তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে চেয়েছে। তাই পান্নাবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।"

অবাক হয়ে বললুম, "তাহলে আইনত সরকার এর মালিক হবেন, তাই না?"

"হ্যাঁ। খনিটা ছিল ব্রিটিশ আমলের কোন্ সায়েবের। নিছক অভ্রের খনি। অভ্র তোলা শেষ হলে দৈবাৎ ইউরেনিয়ামের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল নীচের স্তরে। কিন্তু সেই সায়েবকে কোনো কারণে দেশে ফিরতে হয়। যাবার সময় নন্দবাবুকে বেচে দিয়েছিলেন।" কর্নেল তাঁর প্রকাণ্ড ব্যাগের দিকে আঙুল তুলে ফের বললেন, "ওই ব্যাগে একটা বই আছে। পড়ে দেখো। ওতে নন্দবাবুর কথা নেই। কিন্তু এদেশের খনির ইতিহাস আছে। প্রচুর তথ্য আছে। ভৈরবগড়ের খনির কথাও আছে। ব্রিটিশ আমলে খনিবিজ্ঞানীরা ভৈরবগড় অঞ্চলে ইউরেনিয়াম থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করেছিলেন।"

ব্যাগ থেকে বইটা বের করে পাতা উলটে বললুম, "এসব পড়ার ধৈর্য আমার নেই। কিন্তু আপনার ব্যাগের ভেতর প্যাকেট-করা প্রকাণ্ড বস্তুটি কী?"

কর্নেল হাসলেন। "কুমোরটুলির ভাস্কর দেবেন পালের আশ্চর্য ভাস্কর্য।"

"আপনার সেই কাটামুণ্ডু! সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দেখছি!! ব্যাপার কী?"

কর্নেল চোখ বুজে বললেন, "আজ রাতে ম্যাজিক দেখাব, ডার্লিং! কাটামুণ্ডু কথা বলবে।"

॥ ছয় ॥

দুপুরে আমার চিরদিন বাঙালির প্রিয় ভাতঘুমের অভ্যাস। গতকাল ভাতঘুমের সুযোগ পাইনি। আজ আমাকে সে লম্বা করিয়ে ছাড়ল। দশরথের ডাকে উঠে দেখি, পাঁচটা বাজে! চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলুম, "কর্নেল কোথায় গেলেন?"

দশরথ বলল, "কর্নিলস্যার পিঙ্কিদিদিকি সাথ ঘুমতে গেছেন।"

মনে পড়ল, সাধুবাবার গুহা দেখাতে নিয়ে যাবার কথা ছিল পিঙ্কির। চা খেয়ে বাগানের শেষপ্রান্তে গিয়ে পোড়োখনি এলাকার দিকে কর্নেল ও পিঙ্কিকে খুঁজলুম। কিছুক্ষণ পরে দুজনকে দেখতে পেলুম। কুকি কর্নেলের কাঁধে চেপেছে। পিঙ্কি হাত নেড়ে কথা বলতে বলতে আসছে। কর্নেল তার কাঁধে একটা হাত রেখে হেঁটে আসছেন।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে মুখোমুখি হলুম ওঁদের। কর্নেল বললেন, "তুমি ঘুমোচ্ছ বলে ডাকিনি ডার্লিং! আশা করি, তোমার রাতের ঘুমটা পুষিয়ে গেছে।"

বললুম, "সাধুবাবার আস্তানায় ঢুকেছিলেন নাকি?"

"কুকিকে পাঠিয়েছিলুম ওঁর হ্যাণ্ডব্যাগ ফেরত দিতে।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। দলিল, হ্যাণ্ডনোট, যা কিছু ছিল, সব ফেরত দিয়েছি।"

পিঙ্কি কুকিকে নিয়ে বাগানে খেলতে ব্যস্ত হয়েছে। সেইসময় যদুবাবু বেরিয়ে এসে ওকে টানতে-টানতে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

বললুম, "ওগুলো তো পান্নাবাবুর কীর্তির প্রমাণ। ওগুলো ফেরত দিলেন কেন?"

"পুলিশ ওঁকে যাতে বমাল ধরতে পারে, তার জন্য। কারণ ওগুলো আমার কাছে থাকলে পান্নাবাবু ধরাপড়ার পর আদালতে বলতেই পারেন, ওগুলো যে তাঁর কাছে ছিল, তার প্রমাণ কী? অর্থাৎ উনি হ্যাণ্ডনোটটা মিছিরজির কাছে হাতিয়েছিলেন, কিংবা দলিলটা রুদ্রবাবুর কাছে, এর তো প্রমাণ নেই। আদালতে কুকুরের প্রমাণ গ্রাহ্য হবে না। বেচারা কুকি তো আর বলতে পারবে না যে সে সাধুবাবার ডেরা থেকে করাড়ি রোটি ভেবে হ্যাণ্ডনোটটা কামড়ে নিয়ে এসেছিল! আর পিঙ্কি তো দেখেনি এর ভেতর কী আছে। হ্যাঁ—বলবে হ্যাণ্ডব্যাগটা সে দেখেছিল কুকির মুখে। কিন্তু ওটা যে পান্নাবাবুর, তা তো প্রমাণ করা যাবে না।"

"কেন? বিদেশী কোম্পানির সেই চিঠিটা?"

কর্নেল হাসলেন। "লোকটা মহা ধড়িবাজ। চিঠিতে যে নাম-ঠিকানা আছে, তা পান্নাবাবুর নয়। জনৈক এম এম বোসের নাম-ঠিকানা। তাও কলকাতার। পান্নাবাবু কলকাতার

ওই ঠিকানায় নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন ছিলেন সম্ভবত। যাক্‌গে, এসো ডার্লিং! এবার রাতের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক।"

এরপর কর্নেল যা সব করলেন, তার মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলুম না। যদুবাবুর সঙ্গে চুপিচুপি কী কথাবার্তা বললেন। তারপর দেখলুম, যদুবাবু দশরথকে ডেকে তেমনি চুপিচুপি কীসব বললেন। দশরথ বেরিয়ে গেল। আমার প্রশ্নের জবাবে কর্নেল শুধু বললেন, "একটু পরেই বুঝবে জয়ন্ত! ধৈর্য ধরো।"

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দশরথ ফিরে এল একবোঝা খড় নিয়ে। যদুবাবু ভাইয়ের শোকে মুহ্যমান। অথচ তাঁর মুখেও একটু হাসির রেখা দেখা যাচ্ছিল। দশরথ খড়ে দড়ি জড়িয়ে একটা কিছু বানাচ্ছিল। একটু পরেই বুঝলুম, সে একটা মানুষ তৈরি করছে।

চুপচাপ দেখতে থাকলুম। মুণ্ডুকাটা একটা মানুষের আদল তৈরি হলে দশরথ তাতে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ তাগড়াই করে ফেলল। এবার কর্নেল তাঁর ব্যাগ থেকে নিজের প্যান্টশার্ট বের করে মূর্তিটাকে পরালেন। তারপর গলার ওপর সেই কাটামুণ্ডুটা চেপে বসিয়ে দিতেই মূর্তিটা একেবারে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারে পরিণত হল।

সন্ধ্যা সাতটায় কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। বললেন, "এক্ষুনি ফিরে আসছি।"

যদুবাবু ও দশরথের মুখে উত্তেজনা দেখা যাচ্ছিল। কর্নেলের ডামি তৈরি করে কাকে ফাঁদে ফেলার আয়োজন হচ্ছে, কে জানে! পান্নালাল ওঝা যদি অত ধূর্ত লোক হন, এই ফাঁদে কি তিনি পা দেবেন? যদুবাবু যেন আমার মনের কথা আঁচ করে মাথা নেড়ে বললেন, "খামোকা চেষ্টা করা। লোকটা খুব ঘড়েল বলে মনে হয় না জয়ন্তবাবু?"

সায় দিলুম। দশরথ বলল, "হামার বহুত ডর বাজছে বড়বাবু! আবার না কুছ গড়বড় হয়ে যায়।"...

কর্নেল আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে বললেন, "দশরথ! ডামিটা ওঠাও। বাগানে নিয়ে চলো। যদুবাবু, আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। বেরুবেন না যেন।"

যদুবাবু চলে গেলেন। মনে হল ভয় পেয়েছেন খুব। দশরথ ডামিটা নিয়ে চলল। বাগানে অন্ধকার জমে আছে। কিন্তু টর্চ জ্বালতে বারণ করলেন কর্নেল। শেষপ্রান্তে গিয়ে ডামিটা একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হল। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, "দশরথ, তুমি বাড়িতে গিয়ে দরজা আটকে দাও। আর শোনো, বাইরের দিকের সব আলো নিবিয়ে দাও এখুনি।"

দশরথ পালিয়ে বাঁচল। কর্নেল আমার হাত ধরে একটা ঝোপের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর টেনে বসিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "যে-কোনো মুহূর্তে চুরাইলের আবির্ভাব হবে। যেন ভয় পেও না।"

কোনো কথা বললুম না। উত্তেজনায় এবং অজানা আতঙ্কে আমার অবশ্য বুক কাঁপছিল। রিভলভার আর টর্চ নিয়ে বসে রইলুম। কর্নেলের চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনছিলুম। বুঝতে পারছিলুম, উনিও খুব উত্তেজিত।

বাড়ির বাইরের আলোগুলো নিবে গেল। অন্ধকার আরও জমাট মনে হল এবার। কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে বলে চাঁদ উঠতে দেরি হবে। দৃষ্টি একটু স্বচ্ছ হলে মিটার-কুড়ি দূরে কর্নেলের ডামিটা অস্পষ্টভাবে টের পাওয়া গেল। বাতাসও কেন কে জানে, বইছে না আর। অন্ধকার রাতটা ক্রমশ বিভীষিকার আসন্ন আবির্ভাবে ঝিম মেরে যাচ্ছে। যদুবাবুর বাড়ির সব জানালা বন্ধ। অন্ধকারে বাড়িটা কালো হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর কুকির ডাক শুনলুম। কেউ তাকে থামানোর চেষ্টা করছিল।

তারপরই চুরাইলের চিৎকার শুনতে পেলুম। আগের সন্ধ্যায়ও পোড়োখনিতে তার চিৎকার শুনেছিলুম। কিন্তু আজকের চিৎকার তার চেয়ে ভয়াবহ। যেন পোড়োখনির রক্তচোষা প্রেতিনী রক্তের গন্ধ পেয়ে খেপে গেছে। ভয়ঙ্কর আর অমানুষিক ওই চিৎকারে বুকের স্পন্দন যেন থেমে যাবে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু টের পাচ্ছি, সে উল্‌টো পায়ে পিছু হেঁটে ক্রমশ এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে। তার সাপের মতো চোখে পলক পড়ে না। একটানা বিকট চিৎকার করে চলেছে সে।

চিৎকারটা থেমে গেল হঠাৎ। তারপর কার কাসির শব্দ শুনলুম। তারপর কেউ অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে ইংরেজিতে বলল, "আসুন। আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।"

যে গাছে কর্নেলের ডামি দাঁড় করানো, তার কাছে মাটির ওপর টর্চের আলো পড়ল। আবছা আলোয় কর্নেলের ডামিটা দেখে মনে হল, অবিকল কর্নেল দাঁড়িয়ে আছেন।

লোকটা টর্চ নিবিয়ে চাপা গলায় ইংরেজিতে বলল, "তাহলে আপনি ব্যুগবো কোম্পানির প্রতিনিধি?"

"হ্যাঁ। আশা করি, আমার চিঠি পেয়েছেন।"

"কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু, জানেন তো?"

"সে কী! ও কথার মানে?"

"মানে এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি।" তারপর লোকটা বাংলায় বলে উঠল, "তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। চুরাইল তোমার মুণ্ডু ছেঁড়ার আগে সেকথা জেনে যাও।" বলে সে তিনবার শিস দিল।

অমনি চুরাইলটা আবার বিকট চিৎকার করে উঠল। তারপর ধপাস করে একটা শব্দ হল। কর্নেল আমাকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং টর্চ জ্বাললেন। আমিও টর্চ জ্বাললুম। বাগানের অন্যদিক থেকেও কয়েকটা টর্চ জ্বলে উঠল।

সেই আলোয় দেখলুম, কাল পোড়োখনিতে দেখা সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা অথবা প্রেতিনী কর্নেলের ধরাশায়ী ডামির ওপর ঝুঁকে গলায় কামড় বসিয়েছে এবং লাল কাপড়-পরা সেই সাধু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রেতিনীর মাথায় মেয়েদের মতো চুল, হাতে শাঁখা!

সাধু পালাবার চেষ্টা করতেই বুটের শব্দ তুলে পুলিশ অফিসার আর কনস্টেবলরা দৌড়ে এলেন। তাকে ধরে ফেললেন।

এদিকে পোড়োখনির প্রেতিনী তখন ফড়ফড় করে খড় আর কাপড় ছিঁড়ছে। রক্ত না পেয়ে খেপে গেছে যেন। মুহুর্মুহু বিকট চিৎকার করে সে ডামিটা ফর্দাফাঁই করে ফেলছিল। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তার মুখে টর্চ ফেললেন। তখন সে মুখ তুলল। নীল জ্বলজ্বলে নিষ্পলক হিংস্র চোখ তার। মাথায় বড় বড় চুল। শাঁখা-পরা হাতে ধারালো বাঁকানো নখ। বিকট গর্জন করে উঠে দাঁড়াতেই কর্নেল পরপর দুবার গুলি ছুঁড়লেন। প্রেতিনী নেতিয়ে পড়ে গেল। আমি দৌড়ে

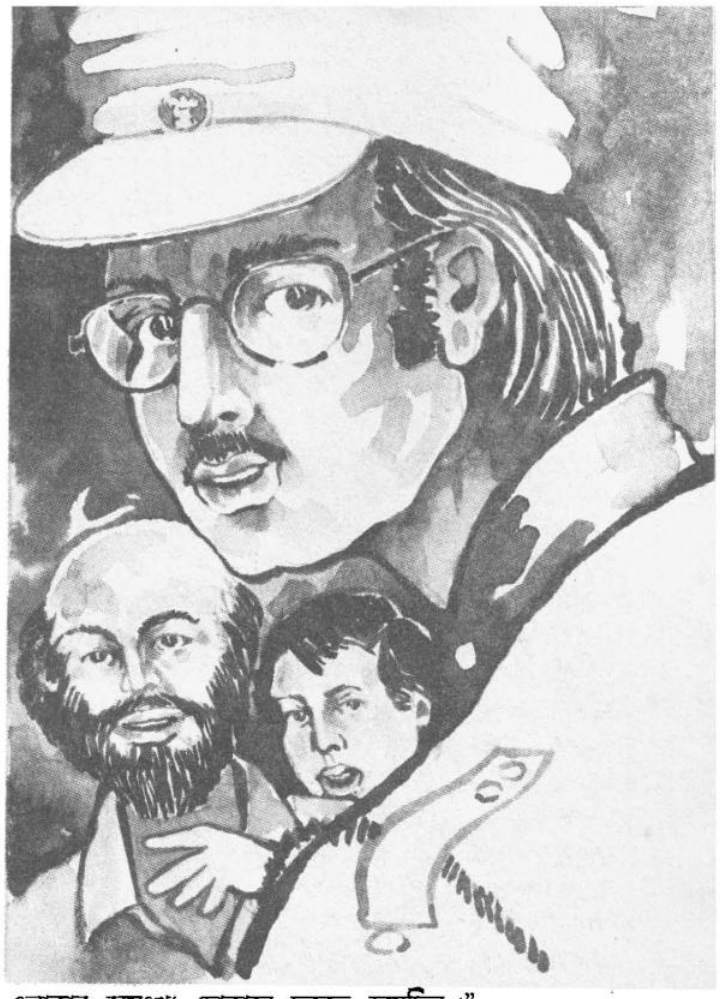

গেলুম কর্নেলের কাছে।

কর্নেল চুরাইলের মাথার চুল ধরে টান দিতেই উপড়ে গেল। কর্নেল হো-হো করে হেসে বললেন, "স্ত্রীলোকবেশী এবং হাতে শাঁখা-পরা এই প্রাণীটিকে আশা করি, চিনতে পেরেছ জয়ন্ত!"

"কী আশ্চর্য! এটা একটা ভালুক না?"

"হ্যাঁ। ভালুকই বটে। তবে খুব শিক্ষিত ভালুক। ওকে পান্নাবাবু মানুষের রক্ত খাইয়ে রক্তলোভী করে তুলেছিলেন।" কর্নেল একজন পুলিশ অফিসারকে বললেন, "মিঃ সিং! তাহলে আসামিকে আপনারা নিয়ে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি থানায়।"

পুলিশ অফিসার হাসতে হাসতে কর্নেলের কাটামুণ্ডুটা কুড়িয়ে বললেন, "আপনার কাটামুণ্ডু কিন্তু চমৎকার কথা বলছিল। আপনি যে এত চমৎকার ভেন্ট্রিলোকুইজম জানেন, ভাবতে পারিনি। নিন আপনার কাটামুণ্ডু।"

কর্নেল তাঁর কাটামুণ্ডু দেখে নিয়ে বললেন, "একটু রঙ চটে গেছে মাত্র। আবার কুমোরটুলি নিয়ে পালমশাইকে দেব।"

ততক্ষণে বাড়ির বাইরের আলোগুলো আবার জ্বলে উঠেছে। যদুবাবু, দশরথ, পিঙ্কি আর তার কুকুর বেরিয়ে এল। পুলিশ সাধুবাবা ওরফে পান্নালাল ওঝাকে থানায় নিয়ে গেল। সর্বনাশা মরা ভালুকটা বাগানে পড়ে রইল। কুকি বারান্দা থেকে সেইদিকে লক্ষ করে খুব ধমক দিতে থাকল। পিঙ্কি কিছু বুঝতে না পেরে তাকে তুলে নিয়ে চাঁটি মেরে বলল, "খুব হয়েছে!"

কিন্তু চুরাইল-রহস্য এভাবে ফাঁস হওয়াতে দশরথ খুশি হয়নি বুঝি। একপ্রস্থ চা এনে দিয়ে বলল, "লেকিন করাড়ি রোটি ইয়ে বদমাস ভালুর না আছে, রামজির কিরিয়া। যো ভালু খুন পিতা, উও কভি রোটি বানানে নেহি জানতা। রোটি ঔর কৈ ভালু বানিয়েছে।"

অতএব করাড়ি রোটি খেয়ে তার ক্ষতি হবে না। কর্নেল আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, "কী ডার্লিং, কাটামুণ্ডুর কথা বলার ম্যাজিক দেখালুম কি না বলো?"

"ভেন্ট্রিলোকুইজম কবে শিখলেন?"

"সম্প্রতি কলকাতার বিখ্যাত এক হরবোলার কাছে শিখতে হয়েছে। তোমার পাশে বসে দিব্যি কথা বলছিলুম সাধুবাবার সঙ্গে। সাধুবাবা ভেবেছিল, গাছে হেলান দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। তবে মহাধড়িবাজ লোক। বিকেলে হ্যাণ্ডব্যাগ ফেরত পাঠানোর সময় সেই বিদেশী কোম্পানির নামে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম, 'আমিই ব্যগবো কোম্পানির প্রতিনিধি। রাত ন'টা নাগাদ যদুবাবুর বাগানে এসে দেখা করুন।' সাধুবাবা চালাকিটা ধরে ফেলেছিল। আমিও জানতুম, সে আমার চালটুকু ধরে ফেলবে। কিন্তু তাহলেও সে আসবে। আমাকে খতম করার জন্য তাকে 'চুরাইল' নিয়ে আসতেই হবে। আমি তার সব প্ল্যান ভেস্তে দিতে চলেছি কিনা।"

"হুঁ, বুঝলুম। কিন্তু চিৎপুরে গুপ্ত কোম্পানিতে যাওয়ার রহস্যটা কী?"

কর্নেল হাসলেন। "তোমার মনে পড়ল তাহলে? হ্যাঁ—তুমি শুধু আমাকে গুপ্ত কোম্পানির দোকানে ঢুকতে দেখেছিলে। কিন্তু আমাকে ওদিন অন্তত সারা চিৎপুর

এলাকার অসংখ্য দোকানে ঢুকতে হয়েছিল।"

"কেন?"

"দুটো জিনিসের তদন্তে। জটাজূট আর অস্বাভাবিক গড়নের একটা পরচুলা সম্প্রতি এক বছরে একইসঙ্গে কেউ কিনেছে কিনা। গত শীতে ভৈরবগড়ে গিয়ে 'চুরাইল'টাকে দেখামাত্র ভালুক বলে সন্দেহ হয়েছিল। তুমি কি ভালুকের মাথা লক্ষ করেছ, জয়ন্ত? ওই মাথায় স্ত্রীলোকের পরচুলা আটকাতে হলে বিশেষ অর্ডার দিয়ে পরচুলা বানাতে হবে। যাই হোক, খোঁজ পেয়ে গেলুম শেষপর্যন্ত। এক পরচুলা-ব্যবসায়ী কথায়-কথায় বলে ফেলল, এক ভালুকওয়ালার অদ্ভুত অর্ডার পেয়েছিল। সে নাকি নিজে জটাজূটধারী সাধু সাজবে এবং তার ভালুককে স্ত্রীলোক সাজিয়ে শাড়ি-শাঁখা পরিয়ে খেলা দেখাবে। তাই..."

বাধা দিয়ে বললুম, "ভালুকটার হাতে শাঁখা দেখেছি। পরনে শাড়িও আছে নাকি?"

"আছে। গণ্ডগোলে এবং আতঙ্কের চোটে লক্ষ করোনি। এখন গিয়ে দেখে এসো, লালপেড়ে শাড়িও আছে।"

দেখে আসার জন্য তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে পা বাড়াতে অস্বস্তি হল। সত্যিকার শাঁখচুন্নি যে নেই, তা কে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে?

আমাকে বসে পড়তে দেখে কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠলেন। পিঙ্কিও ব্যাপারটা টের পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। এবার কুকি সুযোগ পেয়ে তাকে ধমক দিল নিজের ভাষায়। পিঙ্কি গম্ভীর হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

রিয়া...

...সতেজ সুন্দর অনুভূতি!

মনোরম সৌরভে
ফুল রিয়া
আর লেবু রিয়া

ফুল রিয়া	লেবু রিয়া
কোমল ও মৃদু!	শীতল ও তরতাজা করা!
সৌখিন গোলাপী সাবান	চন্‌মনে সবুজ সাবান
ফুলের হাল্‌কা সৌরভে!	লেবুর লোভনীয় সৌরভে!

রিয়া সুরভিত সাবান

টাটার তৈরী

CASTR-8-223 BEN

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

টেস্ট-জীবনে আন্তর্জাতিক মানের বহু ফাস্ট-বোলার দেখেছি। ১৯৫১-৫২ সালে টেস্ট-ক্রিকেটে যোগ দিয়ে প্রথমেই দেখা পেলাম ব্রায়ান স্ট্যাথামের। ভারী চমৎকার বোলার। নিখুঁত লেংথে বল করতে পারতেন। সঠিক নিশানায় বল ফেলে প্রতিবারই চেষ্টা করতেন ব্যাটসম্যানকে খেলাবার। অধিকাংশ বোলারকে দেখেছি স্টাম্পের বাইরে বল দিতে—ব্যাটসম্যানকে লোভের ফাঁদে জড়াবার জন্য। কিন্তু সব বলই যে তাঁরা ইচ্ছে করে স্টাম্পের বাইরে ফেলেন এমন নয়। বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার ফলে তাঁদের বল পড়ত স্টাম্পের বাইরে।

স্ট্যাথামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। তাঁর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। উইকেট লক্ষ করে আক্রমণ করে যাওয়াটাই ছিল তাঁর ধাঁচ। উইকেটের বাইরে অযথা বল ফেলে বল নষ্ট করাকে তিনি বোধহয় ঘোরতর অন্যায় বলে মনে করতেন। স্টাম্পের মধ্যে খেলতে গিয়ে ভুল করে ব্যাটসম্যান আউট হবে, এটা তিনি অনেক বেশি পছন্দ করতেন। ব্যাটসম্যানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে, উইকেটের বাইরে ভুল করানোর খেলা তাঁর কাছে বোধহয় বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল না।

স্ট্যাথাম-ট্রুম্যান জুটি, দ্রুত বোলিংয়ের ক্ষেত্রে ইতিহাস-বিখ্যাত। ক্রিকেটের যে কয়টি পেস-জুটিকে চিরকাল মানুষ স্মরণে রাখবে, এই জুটি সেই তালিকায় উজ্জ্বল স্থান পাবার অধিকারী। এই দু'জন বোলারের মধ্যে কে বড়, যদি কেউ আমাকে এই প্রশ্ন করেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্রায়ান স্ট্যাথামের নাম করব। দুজনকেই খেলেছি। দুজনেরই বলের গুণপনা দেখেছি। স্ট্যাথামের পক্ষে ভোট দেবার আগে কোনো দ্বিধা বা সংশয় আমাকে বিব্রত করবে না।

বাহান্নতে ইংল্যাণ্ডে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে লিডসে তিনি যখন অভিষিক্ত হলেন তখন ফ্রেডি ট্রুম্যান যথার্থই একজন 'ইয়র্কশায়ারীয় চাষাড়ে ছোকরা'। বলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার বদলে গতির তীব্রতাই বেশি। শুধু তাই নয়, আক্ষরিক অর্থে তিনি একজন 'ইরাটিক' বোলার। লেংথের বিশেষ স্থিরতা ছিল না। নিশানাও এলোমেলো। যা ছিল, তা হচ্ছে ভয়ংকর গতি।

সেই গতিকে যাঁরা সামাল দিতে পেরেছেন, তাঁরা আর অন্য কোনো কারণে ট্রুম্যানকে বিশেষ পরোয়া করেননি। এ ছাড়া ভয় করার আর কী ই বা ছিল ? বড় সুইং নেই, মারাত্মক কাটার নেই, কাকে ভয় করবে ব্যাটসম্যান ? লিডসে মঞ্জরেকারের ১৩৩ রানের অনুপম ইনিংসটার কথা মনে পড়ছে। প্রথম ইনিংসে দুদিক থেকে আলেক বেডসারের চাতুর্য ও ফ্রেডি ট্রুম্যানের গতির অনবদ্য মোকাবিলা করেছিলেন বিজয় মঞ্জেরেকার। ট্রুম্যানের স্পিড সামলে নিয়ে তারপর বোলারটিকে মঞ্জরেকার যেভাবে মেরেছিলেন তা বহুদিন আমার মনে থাকবে। আজও দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসছে।

অন্যদিকে, স্ট্যাথামের বলে কাজ ছিল অনেক। সুতরাং ব্রায়াম স্ট্যাথামকে খেলতে হলে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হত। কেননা, শুধু গতির চেয়ে সুইংসমৃদ্ধ গতির বলে বিপদ বেশি। আর সেই বোলার যদি কেবল স্টাম্প আক্রমণ করে বল করতেই পছন্দ করেন তবে তো কথাই নেই, প্রতি মুহূর্তে ব্যাটসম্যানের স্নায়ু আশঙ্কায় টানটান হয়ে থাকে।

তোমরা অবশ্য বলতে পারো, তাহলে ট্রুম্যানের উইকেটের সংখ্যা স্ট্যাথামের চেয়ে বেশি কেন ? হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন বটে। ফ্রেডির চেয়ে ব্রায়ান বেশি টেস্ট খেলেছেন। তবু, ট্রুম্যানের শিকার-সংখ্যা স্ট্যাথামের চেয়ে পঞ্চান্নটা বেশি। ১৯৫০ সালে শুরু করে পনেরো বছর টেস্ট খেলেছিলেন স্ট্যাথাম। পঁয়ষট্টিতে যখন অবসর নিলেন তখন তাঁর ঝুলিতে জমা পড়েছে ২৫২টা উইকেট। বাহান্নতে শুরু করে ট্রুম্যানও অবসর নিয়েছেন পঁয়ষট্টিতে। কিন্তু তখন তাঁর ঝুলি টেস্ট-ক্রিকেটে সবচাইতে ওজনদার ঝুলি—৩০৭টা উইকেট। সে-আমলে সেটাই ছিল বিশ্বরেকর্ড। এখন অবশ্য বিশ্বরেকর্ড হাতের মুঠোয় রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ার অবিস্মরণীয় ফাস্ট-বোলার ডেনিস কিথ লিলি।

সে যাই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে, ট্রুম্যান বেশি উইকেট পেলেন কেন ? এর উত্তরে অনেক কিছু বলার আছে। ক্রিকেটের তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। অনেক কিছু বোঝাতে হবে তোমাদের। কিন্তু এটাকে ক্রিকেট-শিক্ষার আসর বা জটিল তত্ত্ব আলোচনার জায়গা করে তুলতে রাজি নই। তাই সেদিকে না গিয়ে, তোমাদের কৌতূহল মেটাতে সহজ একটা কারণ বলি। স্ট্যাথামের বোলিং সম্পর্কে সকলেই অবগত ছিলেন যে, তিনি মাপা লেংথ ও স্থির নিশানার বোলার। এবং সুইংগুলোও বিপজ্জনক। সুতরাং সব ব্যাটসম্যানই স্ট্যাথামকে খেলবার সময় বেশি সতর্ক হয়ে পড়তেন। আলগা বল না পড়লে, সহজে ব্যাট তুলতেন না তাঁরা। স্ট্যাথামের বলে ধৈর্য ধরে খেলতে-খেলতে একসময় ব্যাটসম্যানরা বিরক্ত হয়ে উঠতেন। হারিয়ে ফেলতেন মেজাজ। হাত খুলে মারতে চাইতেন। এই অবস্থায় অন্যপ্রান্তে দেখা মিলত ট্রুম্যানের। ইরাটিক বোলারের বলগুলো অনেক বেশি লোভনীয় হয়ে উঠত ব্যাটসম্যানদের কাছে। ফলে ব্যাট চলত। জানো তো, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মারতে গিয়ে সামান্য ভুলের জন্য ব্যাটসম্যানরা অধিকাংশ সময় ধরা পড়তেন স্লিপ-অঞ্চলে। কট বিহাইণ্ডও হত প্রচুর। সবই ধৈর্যচ্যুতির ফল। মেজাজ হারিয়ে ফেলার গুনাগার দিতে হয়েছে তাঁদের। (ক্রমশ)

শিবাজির কিন্তু যুদ্ধে
বেরুবার কোনো চেষ্টা নেই

মাঝে মাঝে শিবাজি
কামারশালায় যান· · ·

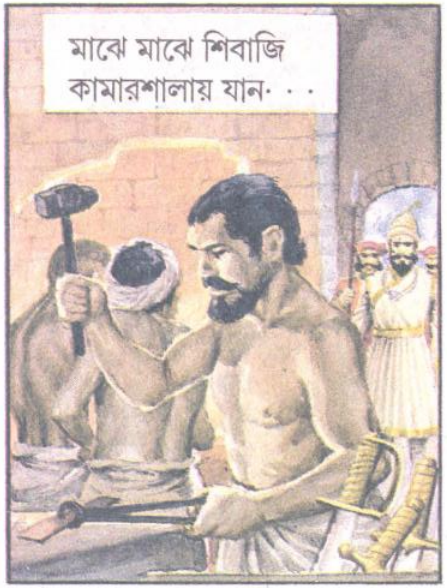

কখনও বা বারুদখানায়
গিয়ে কাজের তদারকি করেন ।

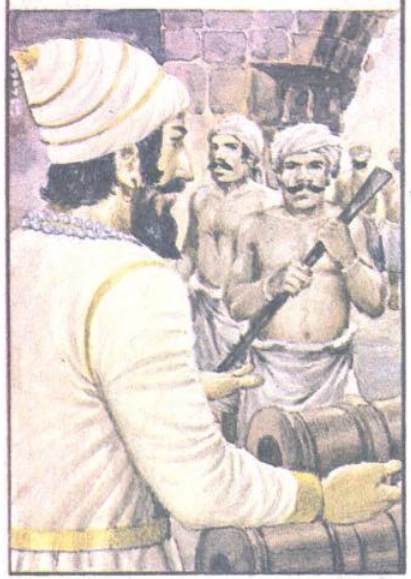

বাকি সময় দপ্তরখানায় বসে
সব্‌নিস চিট্‌নিস সুবাদারথানাদারদের
সঙ্গে পরামর্শ করছেন ।

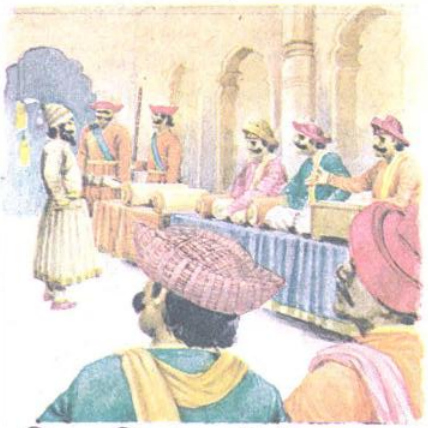

ভিতরে ভিতরে একটা উদ্যোগ
চলছে, কিন্তু বাইরে
কিছু প্রকাশ নেই ।

যে দু'হাজার সিল্লাদার
সেপাই আগে থাকতে ছিল,
তারা মহলের চারপাশে
ছাউনি ফেলে থাকত· · ·

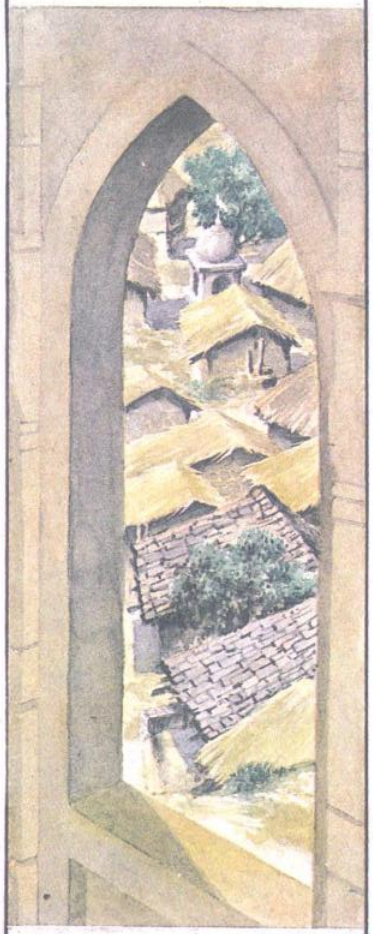

যতদিন শিবাজি এখানে
ছিলেন না, ততদিন তাদের
কোনো কাজ ছিল না ।

· · · দিনরাত জোয়ার-বাজরির রুটি
খেত আর হৈ-হল্লা করে বেড়াত ।

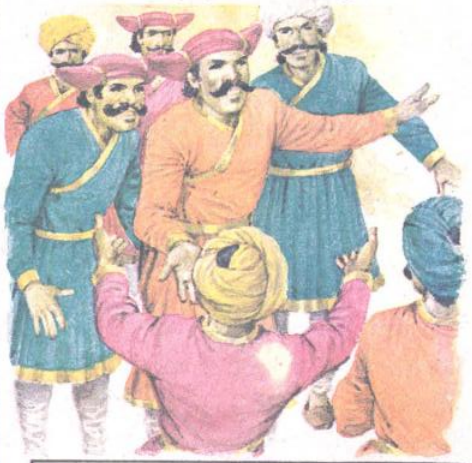

এখন শিবাজি আসার
সঙ্গে সঙ্গে সবার টনক নড়ে গেল ।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

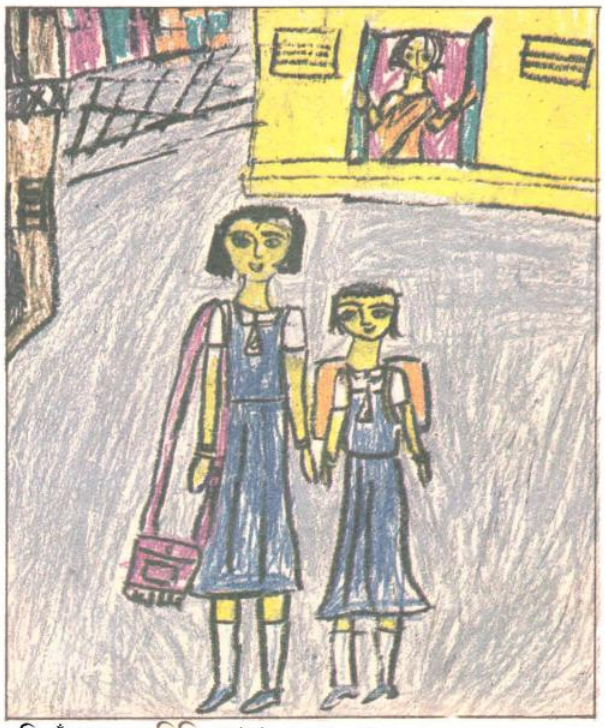

ছবি এঁকেছে অদিতি **লাহা** (বয়স ৫)

ঠাকুরঘরে সাপ

আমার ঠাকুমা বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে থাকেন। আমাদের বাড়িতে প্রচুর সাপ আছে। সাপুড়েরা আসে সাপ ধরতে।

গ্রামে আলো না থাকায় কেরোসিনের বাতি ছিল একমাত্র সম্বল। প্রতিদিনের মতো ঠাকুমা একদিন সন্ধেবেলায় ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। ঘরে ঢুকে ঠাকুমা ইঁদুর বা আরশোলার শব্দ শুনতে পেলেন না। তখন তিনি বুঝলেন যে, ঘরে এমন একটা জীবের আবির্ভাব ঘটেছে যার জন্য ঘর এত নিস্তব্ধ।

তিনি তাঁর ভৃত্য হরিকে আলো নিয়ে আসতে বললেন। আলো এলে দেখা গেল ঘরের কোণে বিশাল একটা কেউটে সাপ। তখন বাড়ির সবাই এসে সাপটাকে লাঠি দিয়ে মেরে ফেলল।

ঠাকুমার বুদ্ধি দেখে আমরা তো অবাক!

রঙ্গন বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১৫)

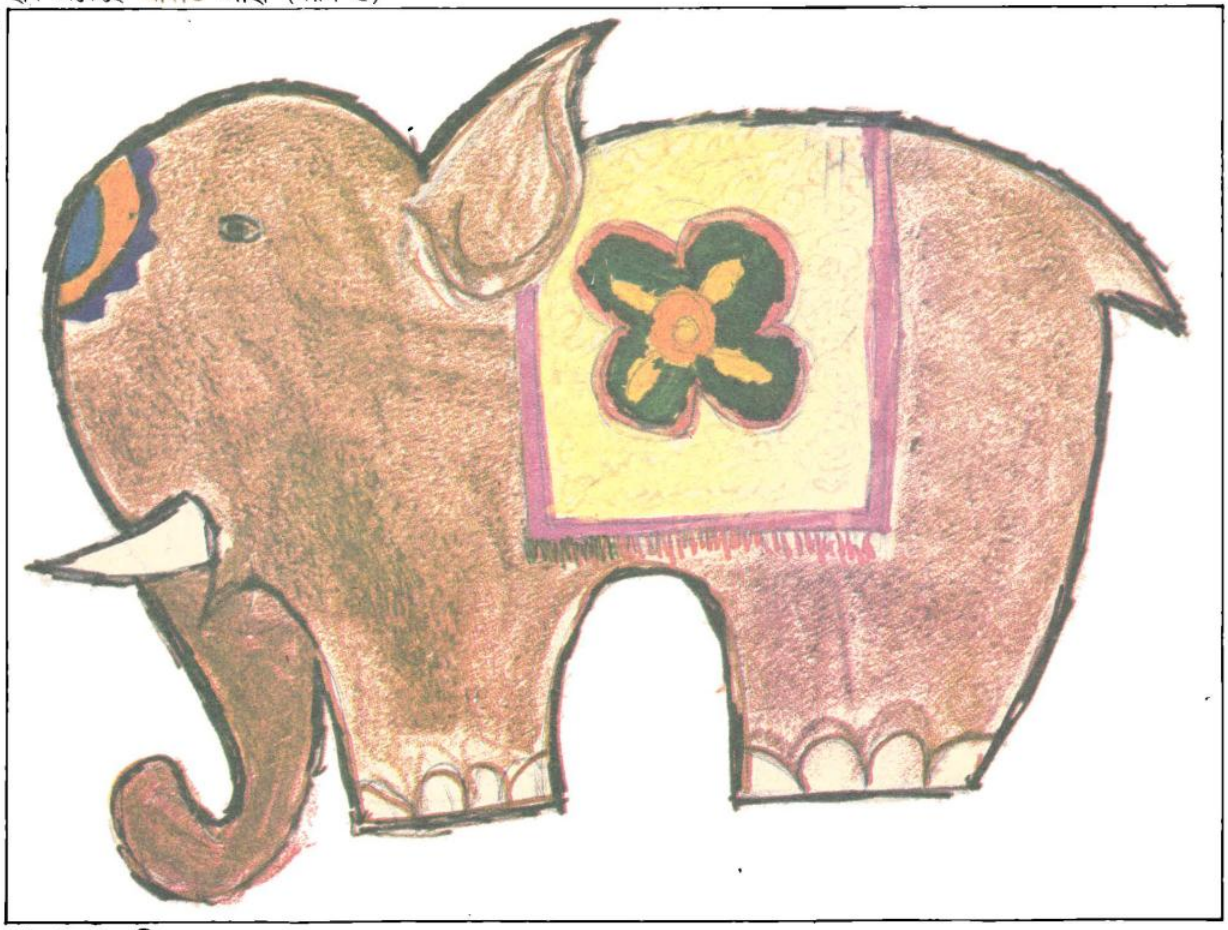

ছবি এঁকেছে **নীলাঞ্জনা রায়** (বয়স ৮)

দেখা হল না

গত মার্চ মাসে আমরা দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা সার্কিট-হাউসে ছিলাম। তখন ওখানে কী ভীষণ শীত !

রাত্রে কম্বল-লেপ গায়ে চাপিয়ে, রুম-হিটার জ্বালিয়ে, আর বিছানার মধ্যে গরম জলের ব্যাগ নিয়ে শুতে হত। তবে সকালবেলায় খুব ভাল লাগত।

ঘরের জানলা দিয়ে রুপোর মতো ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত। অবশ্য যেদিন কুয়াশা থাকত সেদিন কিছুই দেখা যেত না। কুয়াশায় সব ঢাকা পড়লে মন খুব খারাপ হয়ে যেত।

আমরা একদিন বাবার সঙ্গে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে গিয়েছিলাম। শেষ রাতে গাড়ি এসেছিল। ঠাকুমা তো ঠাণ্ডার ভয়ে গেলেনই না। টাইগার হিলে পৌঁছে দেখি আমাদেরও আগে অনেকেই এসে গেছেন। কত গাড়ি ! সবাই আগ্রহের সঙ্গে সূর্যোদয় দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। সূর্যোদয়ের ছবি তোলার জন্য অনেকে তৈরি।

সূর্যোদয় শুরু হল বেশ সুন্দরভাবে। কিন্তু এ কী ? কোথা থেকে একটুকরো কালো মেঘ এসে গেল যে ! কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওই মেঘ সব ঢেকে দিল। আর কিচ্ছু দেখা গেল না।

সূর্যোদয় দেখতে না পেয়ে সবারই খুব মন খারাপ। আমার তো কান্না পাচ্ছিল। টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের কত গল্প শুনেছি, কিন্তু কিছুই দেখা হল না। এখানে সূর্যোদয় দেখতে পাওয়া নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। সেদিন অত লোকের মধ্যে কি একজনও ভাগ্যবান ছিল না ? বাবা অবশ্য বললেন, টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে না পাওয়ার দুঃখ স্যাণ্ডাকফুতে নিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে দেবেন।

পারমিতা সেনগুপ্তা (বয়স ৯)

এয়ারপোর্টে

কিছুদিন আগে আমার বাবা বিদেশে গিয়েছিলেন। বাবার বিদেশ যাবার দু-এক মাস আগে থেকেই আমার ও দিদির খুব উৎসাহ ছিল এয়ারপোর্ট দেখতে যাবার। তা ছাড়া, কী-কী কিনে আনতে হবে তার তালিকা বানাতেও কম উৎসাহ ছিল না।

বাবার যাবার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল আমাদেরও এয়ারপোর্ট দেখার উৎসাহও তত বাড়তে লাগল। কিন্তু, আমাদের গল্প মনে-মনেই থাকল, এয়ারপোর্টে যাওয়া আর হল না। বাবাকে হঠাৎ দু'দিন আগেই এখান থেকে দিল্লি রওনা দিতে হল ভিসার ব্যাপারে গণ্ডগোল হওয়ায়। তাতে আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

বাবা ফেরার সময় আমরা অবশ্য মা'র সঙ্গে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম।

এয়ারপোর্টে এসে খুব অবাক হয়ে দেখলাম কত বড়-বড় প্লেন পাখির মতো আকাশে উড়ে যাচ্ছে। কত প্লেন আবার উড়ে এসে নামছে। আমি আশ্চর্য হয়ে প্লেনের ওঠা-নামা দেখলাম।

অনেকক্ষণ বাদে বাবার প্লেন এল। বাবাকে প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে আমি ও দিদি হাত নাড়লাম, বাবাও আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। কিন্তু, বাবা কাছে আসতেই জানতে পারলাম, বাবার জিনিসপত্র বোঝাই দুটো স্যুটকেস হারিয়ে গেছে। শুনে আমাদের ভীষণ খারাপ লাগল। পরে অবশ্য শুনলাম, স্যুটকেসদুটো পাওয়া যেতে পারে।

ধ্রুবশংকর দে (বয়স ৯)

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি বর্ধমানের এক গ্রামে এসেছে তাদের জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজে। জ্যাঠামশাই রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে নানারকম ফলের বাগান করেছিলেন। কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই কী জন্য যেন লেবুবাগানে এসেছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। দিপু আর ইরানি এসে দেখল, লেবুবাগানের কয়েকটা গাছ কে যেন উপড়ে ফেলেছে। লেবুবাগানটা বেশ বড়, ভেতরটা অন্ধকার। তার ভেতরে ঢুকে দেখা গেল ভেতরে একজন পাগল বসে আছে। এখানে এককড়ি নামে যে লোকটি রান্না করে, সে-ও পাগলাটে ধরনের। তার সঙ্গে রাত্তিরবেলা বৃষ্টির মধ্যে লেবুবাগানে এসে দিপু একটা গাছের ঝাপটা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তারপর···

ইরানির বৃষ্টি খুব খারাপ লাগে। বিশেষত কলকাতার বাইরে কোথাও গেলে। ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। বাইরে এমন অন্ধকার যে বৃষ্টিও দেখা যায় না।

ইরানি আজ সারাদিনের ঘটনা ভাবল। এক দিনের মধ্যে কত কী কাণ্ড হল। দেখা হল কতরকম মানুষের সঙ্গে। কলকাতায় থাকলে দিনের পর দিন নতুন কোনো লোকের সঙ্গে পরিচয়ই হয় না। আর আজ ট্রেনের সেই লোকটা, যে ডাকাতদের রিভলভারটা নিয়ে চলে গেল! যাবার সময় বলে গেল, আবার দেখা হবে! আশ্চর্য ব্যাপার।

খানিকটা আগে পুলিশের যে দারোগাটি এসেছিলেন, তিনিও কীরকম যেন অদ্ভুত ধরনের। হঠাৎ কেন এককড়ির ওপর রেগে গেলেন? অবশ্য এককড়ির মতন পাগলাটে মানুষও ইরানি আগে দেখেনি।

জ্যাঠামশাই কোথায় চলে গেলেন তা ইরানি কিছুই বুঝতে পারছে না। এখানকার লোকেরাও কেমন যেন উল্টোপাল্টা কথা বলছে। বাজ পড়ে পেয়ারাবাগানটা অনেকটা পুড়ে গেছে, লেবুবাগানের কয়েকটা গাছ কে যেন উপড়ে ফেলেছে। এর সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কী সম্পর্ক?

ইরানি ভেবেচিন্তে দেখল, জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ করার ব্যাপারে সে আর দিপু কিছু করতে পারবে না। গল্পের বইতে শখের ডিটেকটিভরা কত সব রহস্যের সমাধান করে ফেলে। ইরানি নিজেও ভেবেছিল, এখানে এসে অনেক ক্লু পেয়ে যাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, এ-সব কাজ সহজ নয়।

কাল সকালেই চলে যেতে হবে এখান থেকে। জ্যাঠামশাইয়ের খবর নিতে আসা হয়েছিল, খবর এটাই পাওয়া গেল যে, জ্যাঠামশাইয়ের কোনো খবর নেই। এখন বাবা যা হোক ব্যবস্থা করবেন। বিকেল পর্যন্তও ইরানির ইচ্ছে ছিল, এখানে কয়েকদিন থেকে গিয়ে যে-করেই হোক জ্যাঠামশাইকে খুঁজে বার করে তারপর ফিরবে কলকাতায়। কিন্তু রাত্রিবেলা, ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা বসে থেকে সে বেশ ভাল করেই বুঝতে পারল যে, এইরকম গ্রামে তাদের মতন শহুরে ছেলে-মেয়েরা এসে কোনোরকম সুবিধে করতে পারবে না।

দিপু কোথায় গেল? কেষ্টকেও কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে আর-কোনো শব্দ নেই, শুধু কোঁয়াও কোঁয়াও করে মোটা-মোটা ব্যাঙদের ডাক শোনা যাচ্ছে। এত ব্যাঙ ধারেকাছেই আছে নাকি? ব্যাঙ থাকলেই নাকি সাপ থাকে।

ইরানি বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াল, তার একটুও ভাল লাগছে না। খাওয়া-টাওয়া সেরে নিয়ে এখন শুয়ে পড়লেই হয়!

একবার বিদ্যুৎ চমকের পর প্রচণ্ড জোরে বাজের শব্দ হল। ইরানি পিছিয়ে এল কয়েক পা। বাজের শব্দে বুকটা কেঁপে ওঠে। পৃথিবীতে যত শব্দ আছে, তার মধ্যে বাজের শব্দটাই বোধহয় সবচেয়ে জোরে। কিংবা অ্যাটম বোমের শব্দ কি আরও জোরে?

একটু পরেই হঠাৎ বৃষ্টি থামল আর আকাশ থেকেও মেঘ কেটে গেল অনেকটা।

ইরানি ডাকল, "দিপু, দিপু!"

কোনো সাড়া নেই।

বৃষ্টি থেমে যাবার পর বাইরেটা আর তেমন অন্ধকার লাগছে না। ইরানি উঠোনে নেমে এসে আবার ডাকল, "কেষ্টদা! দিপু!"

এবারেও কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। কী ব্যাপার, এরা সব গেল কোথায়?

একটু দূরে রান্নাঘরের আলোটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ইরানি এগিয়ে গেল সেদিকে।

কয়েক পা যেতেই পুঁ-উ-উ-উ করে একটা শব্দ হতে লাগল। খুব কাছেই। ইরানি প্রথমে বুঝতে পারল না শব্দটা কিসের। তারপর দেখল একটা পোকা ঐ রকম শব্দ করে তার মুখের চারপাশে ঘুরছে।

ইরানি ভয়ে মুখটা চাপা ছিল দু'হাতে। পোকা-টোকা সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কোথায় কুট করে কামড়ে দেবে আর অমনি ঘা হয়ে যাবে!

পোকাটা কিন্তু তীক্ষ্ণ শব্দ করে ঘুরতেই লাগল তার মুখের চারদিকে। ইরানিকে কামড়াল না।

একটু পরেই ইরানি টের পেল, কী যেন জড়িয়ে যাচ্ছে তার হাতে। সুতোর মতন।

ইরানি মুখ থেকে হাতটা সরাতে গিয়ে দেখল, মাকড়সার জালের মতন সূক্ষ্ম অসংখ্য সুতো তার হাত আর মুখ জড়িয়ে ফেলেছে। সুতোগুলো কিন্তু শক্ত নয়। ইরানি জোরে জোরে হাত নাড়তেই সেগুলো ছিঁড়ে যেতে লাগল।

পোকাটাই ঘুরে-ঘুরে ঐ সুতো বুনে চলেছে।

ইরানি বেপরোয়া হয়ে গিয়ে এক দৌড় মারল রান্নাঘরের দিকে।

পোকাটা কিন্তু ইরানিকে তেড়ে এল না। আপাতত নিরীহই মনে হয়। পুঁ-উ-উ-উ শব্দ করে উড়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইরানি হাঁপাতে লাগল। এ কী

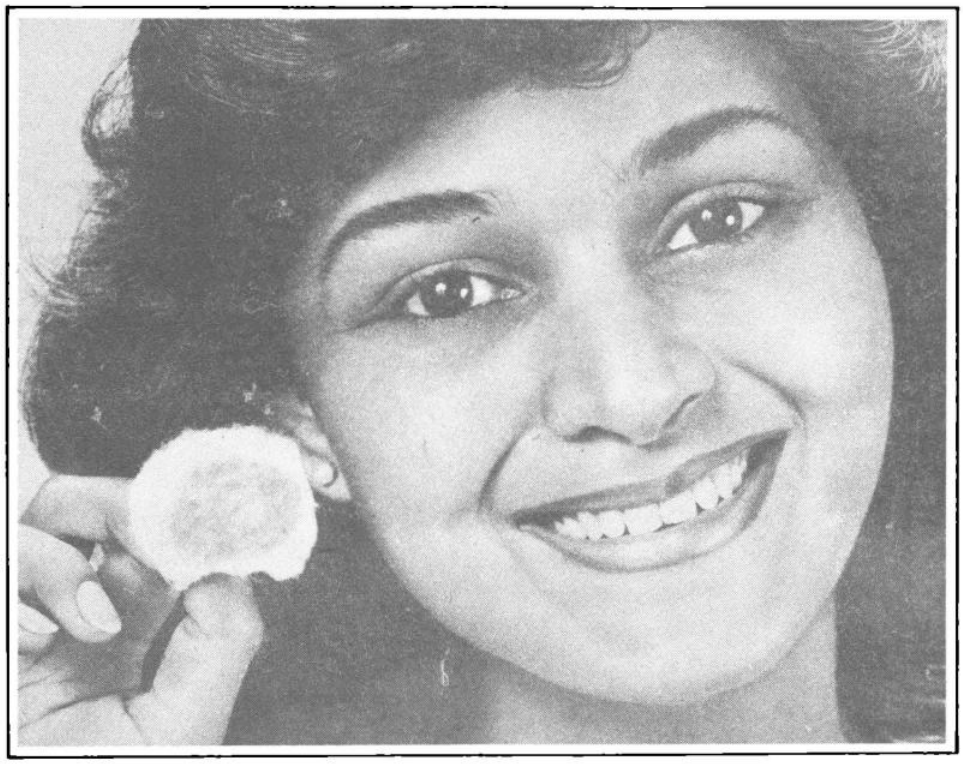

ক্লিয়ারাসিল তুলোর পরীক্ষা করে দেখুন। তেল আর ময়লা দেখছেন তো? এর জন্যই তো ব্রণ হ'তে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার লুকোনো তেলও ময়লা বার করে দিয়ে, মুখমণ্ডলে যে ত্বকের সমস্যার উদ্ভব হয় তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে

তেলতেলে ত্বক ব্রণ হবার মুখ্য কারণ
তেলতেলে ত্বক ধুলোবালি আকর্ষণ করে বলে লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ব্রণ দেখা দেয়। সাধারণ সাবান ও জল শুধু ত্বকের ওপরের ভাগের ময়লাটুকুই পরিষ্কার করতে পারে।

ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার— তেলতেলে ত্বকের জন্য বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী
ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ত্বকের গভীরে গিয়ে পরিষ্কার করার ক্ষমতাযুক্ত এবং এতে আছে বিশেষ ঔষধিযুক্ত ফর্মুলা। এর তেল দ্রবকারী ক্ষমতা এবং পরিষ্কার করার উপাদানগুলি লোমকূপের মুখ খুলে দেয় এবং ত্বকের গভীরে গিয়ে লুকোনো তেল ও ময়লা বার করে আনে।

প্রমাণের জন্য, এই তুলোর পরীক্ষাটি করে দেখুন।
প্রথমে আপনার মুখটি যথারীতি ধুয়ে নিন। এবার কিছু তুলো ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার দিয়ে ভিজিয়ে নিন। এটি দিয়ে মুখ অর্থাৎ, নাক, কপাল, গাল, থুতনীর আসেপাশে মুছে নিন।

ময়লা দেখতে পেলেন তো? এতেই প্রমাণ হয় সাধারণ সাবান ও জল লুকোনো তেল ও ময়লা পরিষ্কার করতে সফল হয় না, কিন্তু ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার কত সহজে তা করেছে।

রক্ষাপ্রদ ঔষধিক্রিয়া ত্বকের সমস্যার সমাধান করেই চলে।
আপনার ব্যবহারের পরেও ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেনজার ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার ত্বককে রক্ষা করে চলে।

সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে: দিনে দুবার বা তিনবার ব্যবহার করুন।

ক্লিয়ারাসিল
মেডিকেটেড ক্লেনজার

OBM-3362-BEN

অদ্ভুত পোকা রে বাবা ! মাকড়সার মুখ দিয়ে এ-রকম সুতো বেরোয় সে জানে। কিন্তু কোনো পোকার মুখ দিয়ে যে সুতো বেরোয় সে-কথা সে কোনোদিন শোনেনি !

রান্নাঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল, সেখানে কেউ নেই। তার খুব রাগ হয়ে গেল। দিপুটা বড্ড অবাধ্য হয়েছে। তাকে একা-একা ফেলে কোথায় চলে গেল ? ইরানি যে তার গার্জেন হয়ে এসেছে, সে-কথা দিপু মানতেই চায় না !

রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে সে আবার বেশ জোরে "দিপু, দিপু" বলে ডাকল।

এবারে খানিকটা দূর থেকে এককড়ি বলল, "ও দিদি, এখানে এসো, শিগগির এসো !"

লেবুবাগানের দিকে ঝলসে উঠল একটা টর্চের আলো।

পোকাটা এখনো ঘোরাঘুরি করছে কিনা সেজন্য ইরানি একটু ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু এককড়ির গলার আওয়াজের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে সে ভয়টা তার তক্ষুনি চলে গেল।

সে দৌড়োল লেবুবাগানের দিকে।

সেখানে গিয়ে সে আবার দারুণ চমকে উঠল। দিপু মাটিতে এমনভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে যে, দেখলেই ভয় করে। সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে মনে হয়।

এককড়ি দিপুকে সাহায্য করবার কোনো চেষ্টাই করছে না। একটা বাঁশ দিয়ে লেবুগাছগুলোকে মারছে আর দুর্বোধ ভাষায় কী যেন বলছে।

ইরানি ছুটে গিয়ে দিপুর পাশে বসে পড়ে তার নাকের কাছে হাত দিল। নিশ্বাস পড়ছে। দিপুর গা গরম। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

ইরানি তার গা ধরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগল। "দিপু ! দিপু !"

তিন চারবার ডাকবার পর দিপু সাড়া দিল, "উঁ !"

"এই দিপু ! তোর কী হয়েছে ? কোথায় লেগেছে ?"

দিপু আস্তে-আস্তে চোখ মেলল। তারপর বলল, "কী হয়েছে ? আমি এখানে শুয়ে আছি কেন ?"

"আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি। কী হয়েছিল তোর মনে নেই ?"

"না তো !"

ইরানি মুখ তুলে কড়া গলায় এককড়িকে বলল, "আপনি ও-সব কী করছেন ? গাছগুলো নষ্ট করছেন কেন ? দিপুর কী হয়েছিল ?"

এককড়ি বাঁশপেটা করতে করতে দুটো বেশ শক্ত লেবুগাছকে একেবারে শুইয়ে ফেলেছে। তার ওপর আরও মারতে মারতে বলল, "তুমি জানো না দিদি ! এরা সাংঘাতিক বদমাস ! অতিশয় পাজি ! হিংসুটে আর কুচুটে। এবারে এদের ঝাড়েবংশে নির্বংশ করব !"

"কী বাজে কথা বলছেন ! দিপুর কী হয়েছে তাই বলুন !"

"এই গাছগুলো ছেলেটাকে মেরেছে। আর একটু হলে মেরেই ফেলত, আমি যদি কাছে না থাকতুম।"

"আবার বাজে কথা ! গাছ কারুকে মারতে পারে ? আপনি ওকে মেরেছেন নিশ্চয়ই !"

"আমি ? বারে বা, বারে বা ! আমি কাছে বলে ছেলেটা বেঁচে গেল !"

দিপু এর মধ্যে উঠে বসেছে। গায়ের জামা একেবারে জলকাদায় মাখামাখি। মাথার চুলেও কাদা লেগেছে।"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "তোর কোথায় লেগেছে রে ? কেউ তোকে মেরেছে ?"

দিপু বলল, "কী জানি, মনে পড়ছে না তো ! না, কোথাও লাগেনি। আমার কী হয়েছিল ?"

"তুই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি !"

"তাই ? এমনি এমনি অজ্ঞান হয়ে গেলুম ?"

"বোধহয় আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলি। তুই বৃষ্টির মধ্যে একা-একা বেরিয়েছিলি কেন ?"

"ঐ যে এককড়িদা বলল, আমায় কী যেন দেখাবে।"

ইরানি এককড়ির দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। তার দৃঢ় ধারণা হল ঐ এককড়িও একজন বদ্ধ পাগল। জ্যাঠামশাই কোনো এক হাট থেকে ওকে ধরে এনেছিলেন। এখানে কতজন পাগল আছে কে জানে !

দিপুর হাত ধরে সে বলল, "চল, ঘরে চল ! কালই আমরা এখান থেকে চলে যাব !"

দিপু কোনো আপত্তি করল না। দিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

এককড়ি গজগজ করে বলল, "বা রে বা ! আমার ওপরে দোষ। আমি ছেলেটাকে বললাম, তুমি সহ্য করতে পারবে না ! এ-সব জিনিস নিয়ে কারবার করা কচিকাঁচাদের কাজ নয়। আমি নিজেই সব সময় তাল সামলাতে পারি না।"

ঘরে ফিরে এসে ইরানি বলল, "চান করে জামা-প্যান্ট বদলে নে ! বৃষ্টির মধ্যে তুই কেন গিয়েছিলি ঐ লেবুবাগানে ?"

দিপু কোনো উত্তর না দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

খানিক বাদে বেরিয়ে আসার পরেও সে চুপচাপ। কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে।

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "তোর শরীর খারাপ লাগছে ?"

দিপু দু'দিকে মাথা নাড়ল।

"খিদে পেয়েছে, কিছু খাবি ?"

"না।"

অনেকক্ষণ বাদে কেষ্ট এসে হাজির হয়ে বলল, "কী হয়েছিল ? খোকাবাবু নাকি আছাড় খেয়েছে ?"

ইরানি বলল, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?"

কেষ্ট বলল, "গিয়েছিলুম একটু গ্রামের দিকে। খাবার-দাবার তো বিশেষ কিছু নেই।"

ইরানি বলল, "আমরা রাত্তিরে আর বিশেষ কিছু খাব না। দু'গেলাস দুধ এনে দিতে পারবেন ?"

কেষ্ট চলে গেল দুধ আনতে।

সেই দুধ খেয়ে ওরা শুয়ে পড়ল একটু বাদেই। ইরানি দরজা বন্ধ করে দিল নিজের হাতে। রঘু নামের ছেলেটি বাইরের বারান্দায় শোবে।

মধ্যরাত পার হয়ে যাবার পর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আস্তে আস্তে উঠে বসল দিপু। ইরানি জেগে আছে কি না তা একটুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখল। ইরানির সমানভাবে নিশ্বাস পড়ছে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে-টিপে দিপু বেরিয়ে এল বাইরে। রঘুকে পাশ কাটিয়ে সে উঠোনে নেমে পড়ল।

(ক্রমশ)

বন্ধু

শ্রীলতা চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হতে না হতে এ-পাড়াটা কেমন নিঝুম হয়ে যায়। আপিসপাড়া কিনা, লোকজন থাকবার বেশি জায়গা নেই। আছে নতুন পুরনো অনেকগুলো আপিস, আর পেট্রল পাম্পের পাশে বুড়ো অশ্বত্থটার তলায় কালুয়ার দোকান। পেট্রল পাম্পের মালিক আপিসঘরের পেছন দিকে মোটা গিন্নি দুটো রোগা-রোগা ছেলে নিয়ে থাকে। আর ভজু সারা রাত দোকানেই কাটায়—ভুতোমামা বলেছে কিনা তাই।

ভুতোমামার বেজায় ভূতের ভয়। অন্ধকার হতে না হতে সারাদিনের পাট গুটিয়ে নিয়ে বাড়িমুখো হয়। ভজুকে বলে, 'খেয়াল রাখিস রে ভজা।' প্রথমে ভজু আপত্তি করেছিল। বলেছিল, 'আমি কী করতে পারব চোর-টোর এলে ? আমার তো মাত্র চোদ্দ বছর বয়স। তারা আমাকে গুলিকাবাব করে খাবে। ফোঁত ! তার চেয়ে ওই নরেনকে থাকতে বলো না।' নরেনের দিকে তাকাতেই সে টুপ করে দোকানের সামনের রোয়াক থেকে নেমে পড়ে হাওয়া !

ভুতোমামা কাষ্ঠ হেসে বলল, 'চোর-ডাকাতের কথা তোকে ভাবতে হবে না। তার জন্য প্রত্যেকটা আপিসে দরোয়ান আছে। একবার হাঁক দিলেই ছুটে আসবে। সক্কলে আমার কাছে টাকা ধার করেছে কিনা।—না রে, আমি জ্যান্ত মানুষের কথাই বলছি না।'

তাই শুনে ভজুর চুলদাড়ি খাড়া। থুতনির কাছটা কেমন শজারুর পিঠের মতো দেখাতে লাগল। ঢোক গিলে বলল, 'অ্যাঁ ! তাহলে কি—তাহলে কি —ভ্—'

ভুতোমামা তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরল। 'আঃ, জ্বালালে। দেখছিস না, সুয্যি হেলেছেন !' তারপরেই টাকাকড়ি গুনে নিয়ে বড় লণ্ঠন নিবিয়ে ছোটটা জ্বালিয়ে বাড়ি চলে গেল। ভজু দু-একটা খদ্দেরকে চা-বিস্কুট হাতরুটি, ঝালআলু দিয়ে ঝাঁপ ফেলে দিল। কী দরকার বাবা !

ছোট্ট দোকানটা। ভুতোমামার বাবা অর্থাৎ ভজুর দাদু কালুয়া তৈরি করেছিলেন সেই কবে। তিনটে দরমার দেয়াল, চতুর্থ দিকে অশ্বত্থগাছের বিশাল গুঁড়িটা। ছাদটাও দরমার তবে অর্ধেকটা গাছের ডালপালা দিয়েই তৈরি। বর্ষাকালে মামা ওখানে একটা ক্যাম্বিসের চাদর টাঙিয়ে দেয়। সেইদিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে গিলে ভজুর পেট ঢাক। যদি ওখান থেকে কিছু নেমে আসে।

হঠাৎ শুনতে পেল ঝাঁপটার উপর কে যেন আস্তে আস্তে টোকা মারছে।অমনি হাত-পা এলিয়ে ভজু মুচ্ছো যায় আর কি। তারপরে শুনতে পেল নেপোর গলা, 'ভজা,অ্যাই ভজা !' ভজু হাঁপ ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঝাঁপ খুলে দিল, অমনি রোগা ফরসা নেপো দোকানে উঠে এসে দিল ওর ঘাড়ে একটা রদ্দা। 'এই সাত-তাড়াতাড়ি ঝাঁপ ফেলার মানে কী র‍্যা ? ভাবলাম বুঝি তুই তোর মামার সাথে কোথাও গেছিস, আর আমারও রাতের খাবারটা ভেস্তে গেল। নে নে, কী আছে বের করে ফেল্ ! খিদে পেয়েছে !'

ভজুর হাতে পায়ে আবার শক্তি ফিরে এল। বলল, 'হাতরুটি, আলুর দম বাকি আছে। আর মাসিমা দুপুরবেলা ভাত, ডাল, মাছের চচ্চড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

নেপো মহাখুশি হয়ে খেতে বসল। বলল, 'তুইও বসে পড় রে ভজা। তারপর খানিকক্ষণ গল্প করব, কেমন ?'

ভজুর ভয়-ভাবনা সব কপ্পুরের মতন উবে গেল। কী ভাল নেপো ! সেই যে প্রথম দিন ওর কাঁদো-কাঁদো মুখ দেখে গুল্‌তি দিয়ে কাক-তাড়ানো ছেড়ে রাস্তা পার হয়ে ভজুর সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল, তারপর থেকে দুজনে হরিহর-আত্মা। সব জিনিসে ভজু নেপোর উপর নির্ভর করে। অথচ সে ভজুর চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। কিন্তু কলকাতার পথেঘাটে মানুষ

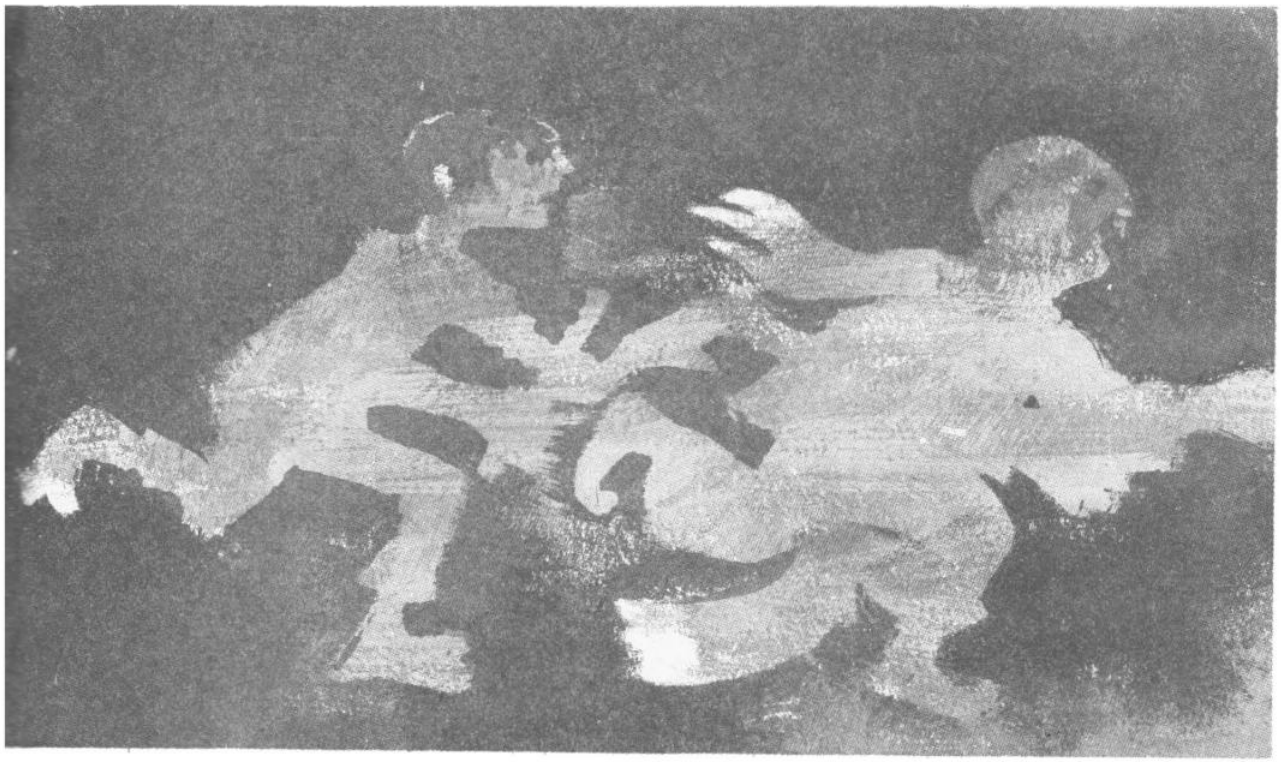

নেপো পাড়াগেঁয়ে ভজুর চেয়ে অনেক বেশি চটপটে, চালাক !

ভুতোমামা নেপোকে মোটেই পছন্দ করত না, নরেন তো নয়-ই। নেপো তাকে ডাকত 'ন্যাকা নরেন', তার পকেটে ব্যাঙ পুরে দিত। মাঝে মাঝে দুই ঠ্যাঙের মধ্যে লাঠিজাতীয় কিছু ঢুকিয়ে দিতেই নরেন চিতপটাং। কী বুদ্ধি নেপোর !

পেট্রল পাম্পের সিংসাহেবও নরেনকে পছন্দ করত না। তাতে ভারী বয়ে যেত নেপোর। বলত, 'কাউকে তোয়াক্কা করবি না, বুঝলি রে ভজা। তাহলে কেউ তোকে কিস্‌সু করতে পারবে না ! আচ্ছা, তুই ঐ ভুঁড়ো সিংকে অত খোশামোদ করিস কেন বল্‌ তো ?'

ভজু বলল, 'মামার খদ্দের কিনা।'

'হুঁ ! ভারী তো খদ্দের ! আচ্ছা চল্‌ তোকে চুড়মুড় খাইয়ে আনি। অ্যাঁ, চুড়মুড় কী জানিস না ? তাহলে জানিসটা কী ?' সত্যি, নেপোর মতন কেউ হয় না। ভজু বললও তাই তাকে। শুনে নেপো মুখের গ্রাস গিলে খুব খানিকটা হেসে নিল।

ভজু বলল, 'না রে। হাসির কথা নয়। তুই আছিস বলেই তো অ্যাদ্দিন ভূতটুতদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। নইলে—' এতটা বলে ভজু চুপ করল। নেপো তো অবাক—'সে কী রে ? ভূত ?'

'মামা বলেছে তারা নাকি এ-পাড়ায় গিজগিজ করছে।'

'তা তো করবেই।' নেপো এক গ্রাস মাছভাত মুখে পুরে দিয়েই বলল, 'কম বয়স এই পাড়ার ! সামনের ঐ আপিসটাই দ্যাখ্‌ না। কম-সে-কম দুশো বছর পুরনো। ওটাতে ভূত নেই বলতে চাস ! জানিস, ওখানে পঞ্চাশটা খুন হয়েছে একশো বছরের মধ্যে।'

ভজু তো কাঠ। নেপো বলে চলল, 'আর ভুঁড়ো সিং যেখানে পাম্প করে বসে আছে সেখানে একটা মস্ত মহাজনের বাড়ি ছিল। সে কী বাড়ি, কী বাড়ি। লোকটার নাম ছিল শেঠ সুরজমল। অ্যাই বিশাল চেহারা, ভুঁড়ো সিঙের চেয়েও বড়। খালি মখমল রেশমের জামা পরত, আর এত্ত এত্ত গয়না। উঃ !'

ভজু চোখ ছানাবড়া করে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী করে জানলি ?'

'আমি জানব না ? আরে সবাই জানে, তোর মতন মুখ্যুরা ছাড়া। এই, ওই ঝাল আচারটা দে তো।'

ভজু আচারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আরো বল্‌।'

'বলছি বলছি !' নেপো হুসহাস শব্দ করে ঝাল আচারটা খেতে খেতে বলল, 'সারাদিন বিরাট তক্তপোশে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে থাকত ব্যাটা। আরে, কী মুশকিল ! সিনেমাতে দেখিসনি ? ঠিক যেন রাজা ! সাহেবরাও খোশামোদ করত তাকে। বিরাট চারঘোড়ার গাড়ি করে বেড়াতে বেরুত।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী ? এটা কি গপ্প ভেবেছিস্‌ ?' নেপো চটে গেল। সব সত্যি !...আরে, ঐ ব্যাটার কাছে সব জমিজমা ঘটিবাটি, গয়নাপত্তর যা ছিল বন্ধক দিয়ে, খেতে না পেয়ে এক গরিব বিধবা ওখানেই মরেছিল। আর তার অনাথ ছেলেটা বলেছিল যে একদিন ঐ শেঠজির হাড়গোড় ভেঙে তালগোল পাকাবে !'

শিউরে উঠে ভজু বলল, 'ইস্‌ ! কী সাংঘাতিক !'

'কেন, সাংঘাতিক কেন ?' নেপো তো অবাক ! 'সারাটা দিন তো ব্যাটা শুয়ে থাকত। হাড়গোড়ের দরকারটা কী, তুইই বল ?—আচ্ছা, তোর খাওয়া কি আর শেষ হবে না রে ? এত খেলে কিন্তু ··· আলুর দম যা আছে আমার পাতেই দিয়ে দে না-হয়। কিচ্ছু নষ্ট করবি না !'

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে ভজু নেপো পাম্পের দেয়ালে লাগানো কলে বাসন হাত-মুখটুখ ধুয়ে দোকানে ফিরে এল। সেদিন আর বেশি গল্প হল না ; দুজনেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। রাত্রে মাঝে-মাঝে নেপো দোকানেই শুত, সকাল হলেই চলে যেত ভজুকে জাগিয়ে দিয়ে। ভজুও তাড়াতাড়ি নিজের আর নেপোর বিছানা গুটিয়ে রাখত। ভূতোমামা যদি কোনোদিন টের পেত যে নেপো দোকানেই রাত কাটায় তাহলে কেলেঙ্কারি বাধাত।

সেদিন ভজুর কিন্তু ভাল ঘুম হল না। মাঝে-মাঝেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল রাস্তায় হাজার হাজার লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের একটুও সাড়া-শব্দ নেই। শেষকালে উঠেই পড়ল। দেখল দোকানের ঝাঁপ খোলা, নেপো রকে বসে কার সঙ্গে কথা বলছে। ভজু উঠে আসতেই নেপো বলল, 'কী রে, ঘুমোতে পারলি না বুঝি ? পইপই করে বললাম রাতে অত খাসনি, তা কে কার কথা শোনে !—আর হ্যাঁ, দ্যাখ, ইনি হলেন আমার বড়কাকা।'

ভজু অবাক হয়ে দেখল রকের এককোনায় বসা একজন রোগা ফরসা লোক, গায়ে একটা ছিটের পিরান আর ধবধবে সাদা ধুতি খাটো করে পরা। চুলগুলো একটু লম্বা-লম্বা, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া। ভজুকে দেখে ফিক করে হাসল।

নেপোর সবটাতে বাড়াবাড়ি। লিকপিকে হাত-পা ছুঁড়ে বলল, 'জানেন কাকাবাবু, ভজাটা রাতে একলা থাকতে পারে না। বেজায় ভূতের ভয়, তাই আমাকে এসে মাঝে-মাঝেই থাকতে হয়।' দুজনে বেজায় হাসতে লাগল।

বড়কাকা বললেন, 'কালুটাকে একটা ভূত-তাড়ানো মাদুলি দিয়েছিলাম। তাই পরে নাও না কেন, খোকা ?'

ভজু অবাক। 'আপনি আমার দাদুকে চিনতেন ?'

'আলবত চিনতাম ! মাদুলিটা বোধহয় গাছের উপর সেই কোটরটাতে রেখেছিল। হয়তো এখনো আছে।'

ভজু হাঁ ! 'কিন্তু, ইয়ে, মানে আপনাকে তো ঠিক বুড়ো বলে মনে হয় না।'

শুনে দুজনে হেসে কুটোপাটি। হঠাৎ কাকাবাবু সোজা হয়ে বসল। 'নেপো, দ্যাখ্ !' ভজুও তাকিয়ে দেখল রাস্তা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চারঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে আসছে, খুরের আওয়াজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কী ভাল আওয়াজটা। খপ্ খপ্ খপ্ খপ্।

গাড়িটা পাম্পের সামনে থামল। দরজা খুলতেই একজন বেঁটে মোটা ফরসা ভদ্রলোক নামলেন। মখমলের জামা পরা, পায়ে নাগরা, আর গায়ের গয়না থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। ভজু বলল, 'ইস্ ! ওই একটা মালা বিক্রি করলে সারা জীবন পায়ের উপর পা তুলে— ।'

নেপো বলল, 'ঠিক !'

ভজুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নেপোর হাতে একটা বেঁটে লাঠি, সে লোকটার দিকে এগোতে আরম্ভ করেছে। ভদ্রলোক ফিরতেই ওদের উপর চোখ পড়ল। কিছুক্ষণ ফ্যাকাসে মুখ করে নেপোর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বিকট চিৎকার করে উলটো দিকে দৌড়। নেপোও তার পেছন ধাওয়া করল। তার পেছনে ভজু ! নেপো একটা নিরীহ থিয়েটারের লোককে মেরে চুরি করবে, তা সে হতেই দিতে পারে না ! নেপো ওর বন্ধু না ?

এলোপাতাড়ি ছুটতে ছুটতে একসময় সত্যি সত্যি ধরে ফেলল নেপোকে। পেছন থেকে জাপটে ধরল ! কিন্তু—আরিব্বাপ্ ! কী জোর নেপোর গায়ে ! ভজুকে ঠেলে সরিয়ে লাঠি বাগিয়ে বাঘের মতন লাফিয়ে পড়ল লোকটার উপর।

'ওরে নেপো ! ওকে ছেড়ে দে রে !' বলে হাঁপাতে হাঁপাতে কেঁদেই ফেলল ভজু।

ওর কান্নার আওয়াজ শুনে পাশেই চা কোম্পানির দরোয়ান ছুটে এল। 'কী ? কী হয়েছে খোকা ?'

'নেপো ! ঐ যে— !' তারপরেই ভজু থ। কোথায় নেপো, কোথায় কে ! রাস্তাঘাট ভোঁ-ভাঁ, জুড়িগাড়ি উধাও।

ধড়মড় করে উঠে বসতেই দরোয়ান খপ করে ভজুর হাত ধরে ফেলল। মুখ সাদা, চোখ ছানাবড়া। 'কী, কী নাম বললে ? নেপো ! কিন্তু— সে তো কবে মরে গেছে ! এইখানে এক মহাজনের বাড়ির সামনে তার মা না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল। নেপোও কিছুদিন পরে মহাজনটাকে পিটিয়ে তার হাড়গোড় ভেঙে পালিয়েছিল। পরে না খেতে পেয়ে সে বেচারাও মারা যায়। শুনেছি সে বড় ভাল ছিল। বড় দয়ালু।' একটু থেমে আরো বলল, 'সে কি আজকের কথা নাকি ? ওর বড়কাকাটা থুত্থুড়ে বুড়ো বয়স অবধি তোমার দাদুর কাছেই ছিল। কালুয়া ওকে বড় ভালবাসত, বুড়োবাবা বলে ডাকত। শুনেছি সে নাকি একশো কুড়ি বছর বয়স অবধি বেঁচেছিল। ওরা সবাই বড় ভাল ছিল।'

ভজু মুখ ঢেকে চুপ করে বসে ছিল। এবার উঠে পড়ে বলল, 'সে আমাকে বলে দিতে হবে না ! যাই, দোকানটা খোলা পড়ে আছে। কালকে মাদুলিটা খুঁজে বার করতে হবে।'

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

শেষ নাটকের গপ্পো

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

পঁচিশে বৈশাখ এগিয়ে আসতেই আমরা ঠিক করলাম এবারে স্কুলে নাটক করতে হবে। গান, আবৃত্তি আর বক্তৃতা তো প্রতিবারই হয়। এবার একটা নাটক করতেই হবে।

টিফিন পিরিয়ডে নাটক নির্বাচনের মিটিং শুরু হল। দিব্যেন্দু ভেবেচিন্তে বলল, "'মুক্তধারা'র কিছু অংশ করা যাক।" সঙ্গে সঙ্গে শিবাজি মন্তব্য করল, "তাহলে অবশ্য তোর খানিকটা সুবিধে হয়, পাগলের পার্টটা তোকে আর চেষ্টা করে করতে হবে না।"

ব্যস, হাতাহাতি লেগে গেল। দিব্যেন্দু রেগে গেলে একটু তোতলাতে থাকে, নাকের ডগা ঘেমে যায়। ও খুব গম্ভীর মুখ করে বলল, "দ্যাখ, এই সি-সিরিয়াস ব্যাপারে ই-ইয়ার্কি ভাল লাগে না।" কে একজন মোটা গলায় শাসন করে উঠল, "শিবাজি, ইয়ার্কির সময় ফাজলামি করিস না।" আবার তুমুল হট্টগোল। নিরুপম হঠাৎ বেঞ্চি চাপড়ে সবাইকে থামিয়ে বলে উঠল, "'মুকুট' হোক।" বলেই আর কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মুকুট সম্পর্কে লেকচার শুরু করে দিল।

নিরুপম গত বছর স্কুলের অ্যানুয়াল ডিবেট কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিল। ও তর্ক জুড়লে প্রতিপক্ষ হারবেই। অতএব মুকুট করাই ঠিক হয়ে গেল।

রিহার্সাল দিতে হলে একটা ফাঁকা ক্লাসরুম চাই আর যারা-যারা অভিনয় করবে তাদের জন্য ফিফ্‌থ পিরিয়ডের পর থেকে ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম কাজটা খুব একটা শক্ত হবে না ; কারণ, স্কুলে প্রচুর ঘর আছে যেগুলোয় কোনো ক্লাস হয় না, কিন্তু দ্বিতীয়টা মানে ছুটির ব্যাপারটায় একটু অসুবিধে হতে পারে। কারণ, এই সাত পিরিয়ডের বদলে 'পাঁচ-পিরিয়ডে-ছুটি'র ব্যবস্থায় অনেক ছেলে হঠাৎ অভিনয় করতে উৎসাহী হয়ে পড়ল। এমন কী লম্বু প্রদীপ বলে উঠল, "আমার ছুটির ব্যবস্থাটাও করিস।"

নিরুপম বলল, "সে কী রে ! তুই তো বললি যে, তুই শুধু পর্দা ফেলবি আর পর্দা তুলবি, তোরও ছুটি ?"

প্রদীপ খুব গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "ঠিক কোন্ জায়গায় সিনটা বন্ধ করতে হবে আর কোন্ জায়গায় খুলতে হবে তার জন্যেও রিহার্সাল লাগে।" আমরা মেনে নিলাম। প্রদীপের মাসতুতো দাদা শুনেছি থিয়েটার করে।

সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। এখন ক্লাসরুম আর ছুটির পারমিশনটা হেডস্যারের কাছে গিয়ে করাতে হবে। শিবাজি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই, দিব্যেন্দু আর নিরুপম যা হেডস্যারের কাছে।" সবাই সায় দিল। শিবাজিটা সাংঘাতিক ছেলে ; ঐ বাঘের মুখে আমাদের ঠেলে দেওয়া ! কিন্তু যেতে হবেই কাউকে, অতএব আমরাই শহিদ হই।

হেডস্যার ঘরে ঢুকতেই বললেন, "কী চাই ?"

আমি সংক্ষেপে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলে তারপর এলাম ছুটির ব্যাপারটায়।

"কতজন এবং ক'দিন তোমরা রিহার্সাল দেবে ?"

"আটজন থাকবে আর পনেরো-কুড়ি দিন রিহার্সাল হবে।"

"অ্যাঁ ! কুড়ি দিন।"

হেডস্যারের গলার স্বর শুনেই তো হয়ে গেছে। বললাম, "ইয়ে…।"

"ইয়ে মানে ? ইয়ে মানে কী ? কুড়ি দিন রিহার্সাল !"

বিপদে পড়লে দেখেছি নিরুপম মোটামুটি ভালই উতরে দিতে পারে। গতবার নাইন 'এ'-র সঙ্গে ক্রিকেট খেলাতেও ও আমাদের উতরে দিয়েছিল স্ট্রেট ব্যাটে খেলে। নিরুপম আমাদের স্কুলের ঐতিহ্য দিয়ে শুরু করল, তারপর রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধ থেকে এলোমেলো উদ্ধৃতি দিতে থাকল। তারপরে বোধহয় রিহার্সালের প্রসঙ্গে আসত, কিন্তু তার আগেই হেডস্যার ওকে থামিয়ে দিয়ে দু সেকেণ্ড নিরুপমকে দেখলেন, তারপর বললেন, "আচ্ছা রিহার্সাল দাও। কিন্তু দেখো, অন্য কোনো ক্লাসের অসুবিধে যেন না হয়।"

ভীষণ উৎসাহে রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। মিলন যুবরাজ, দিব্যেন্দু ইন্দ্রকুমার, শ্যামল ইশা খাঁ আর আমি রাজধর। শিবাজিকে দেওয়া হয়েছে আরাকানরাজের পার্ট ; নিরুপম বলেছে যে ও একটা ছোট্ট পার্ট করবে ; ও হয়েছে রাজধরের দূত। নাটকের দিন এগিয়ে আসে কিন্তু শিবাজির আর পার্ট মুখস্থ হয় না। ওকে ধমক দিলে হাসে আর বলে, "দেখবি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।"

শিবাজিকে শেষ অবধি রেগেমেগে একদিন বলেই ফেললাম, "শিবাজি, এটা পরীক্ষার হল্ না যে ম্যানেজ করবি, এটা স্টেজ। এখানে সবাই তোর দিকে তাকিয়ে থাকবে আর সবাই ট্যারা নয়।"

ও হো-হো করে হেসে উঠল, বলল, "দেখবি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। আমার একদম মুখস্থই হয় না।"

নাটকের দিন এসে গেল। দিব্যেন্দু প্রচুর খেটেখুটে নাটকের পোশাক তৈরি করেছে। ওর মায়ের জর্জেট শাড়ির ওপর রাঙতার চুমকি বসানো হয়েছে। এগুলো ধুতির মতো পরা হবে। চাঁদা বেশি ওঠেনি তো, তাই এই ব্যবস্থা। শাড়িগুলো ধুতির মতো করে পরে দেখা হল। দিব্যি রাজকুমার-রাজকুমার দেখাচ্ছে। অভিনেতারা মুখে রঙ মাখবে, সেটাও দিব্যেন্দু বানিয়েছে ফ্রেঞ্চ চকের সঙ্গে আলতা মিশিয়ে। নিরুপম কোত্থেকে এসে রায় দিল, রাজধর মুখে রঙ মাখবে না। আমার খুব রাগ হল। ওদের সবাইকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে আর আমাকে মাখতে দেবে না। নিরুপম কোথা থেকে আবিষ্কার করেছে যে, রাজধর নাকি দেখতে সুন্দর নয়। রবীন্দ্রনাথ কোথায় বলেছেন কে জানে। নিরুপম যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, রাজধরের মনটা অসুন্দর, তাই ওর চেহারাটাও অসুন্দর হওয়া উচিত। কী যুক্তি ! পরে মনে হয়েছিল ভাগ্যিস মাখিনি বস্তুটা, কারণ রঙ-মাখা অভিনেতারা রঙ ওঠাতে না পেরে দুদিন স্কুলে আসতে পারেনি। শিবাজিও রঙ মাখেনি, তবে কাজল দিয়ে গোঁফ আর মোটা ভুরু আঁকা হয়েছিল। ও পরেছে একটা ফ্রক—দিব্যেন্দুর বোনের স্কুল ড্রেস। কোমরে তলোয়ার ঝুলছে। ইতিহাস বইতে আঁকা গ্রিক যোদ্ধার মতো দেখাচ্ছে ওকে।

গৌতমের গান, হেডস্যারের বক্তৃতা আর বাংলাস্যারের আবৃত্তির পর নাটক আরম্ভ হল। নাটকটা প্রথম দুটো দৃশ্য হবার পর বেশ জমে গেল। গণ্ডগোলটা শুরু হল দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে।

আরাকানরাজের শিবির। আরাকানরাজ ও রাজধর। শিবাজি আরাকানরাজ। বেশ রাজা-রাজা দেখাচ্ছিল। ও সংলাপ বলতে শুরু করল, "দেখুন রাজকুমার, আমাকে বন্দী করে আপনাদের কোনো লাভ নেই।"

আমি রাজধর। সপাটে উত্তর দিলাম, "কেন লাভ নেই রাজন ? এই যুদ্ধের মধ্যে আপনাকে লাভ করাই তো সবচেয়ে বড় লাভ।" সবাই থমথমে মুখে শুনছে।

আমি বললাম, "শুধু সন্ধিপত্র দিলে তো হবে না মহারাজ। আপনি যে পরাজয় স্বীকার করলেন তার কিছু নিদর্শন তো দেশে নিয়ে যেতে হবে।"

শিবাজি চুপ। নির্ঘাত পার্ট ভুলে গেছে। হঠাৎ দেখি, ও ঘাড় সোজা রেখে দৃষ্টিটাকে তলোয়ারের খাপের ওপর ফোকাস করল। দেখি তলোয়ারের খাপে খুদে খুদে অক্ষরে ভর্তি একটা কাগজ সাঁটানো। একবার দেখেই ও স্যাট করে বলে উঠল, "আপনাকে পাঁচশত ব্রহ্মদেশের ঘোড়া ও তিনটি হাতি উপহার দেব।" দর্শক কিছু বুঝতে পারল না, কিন্তু আমি এই কাণ্ড দেখে প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলাম।

শিবাজি ডেঞ্জারাস ছেলে ! ও এরই মধ্যে ফিসফিসিয়ে বলছে, "এই হাসিস না, নাটক ভুলে যাবে, হাসিস না।" আমি সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করো [illegible]

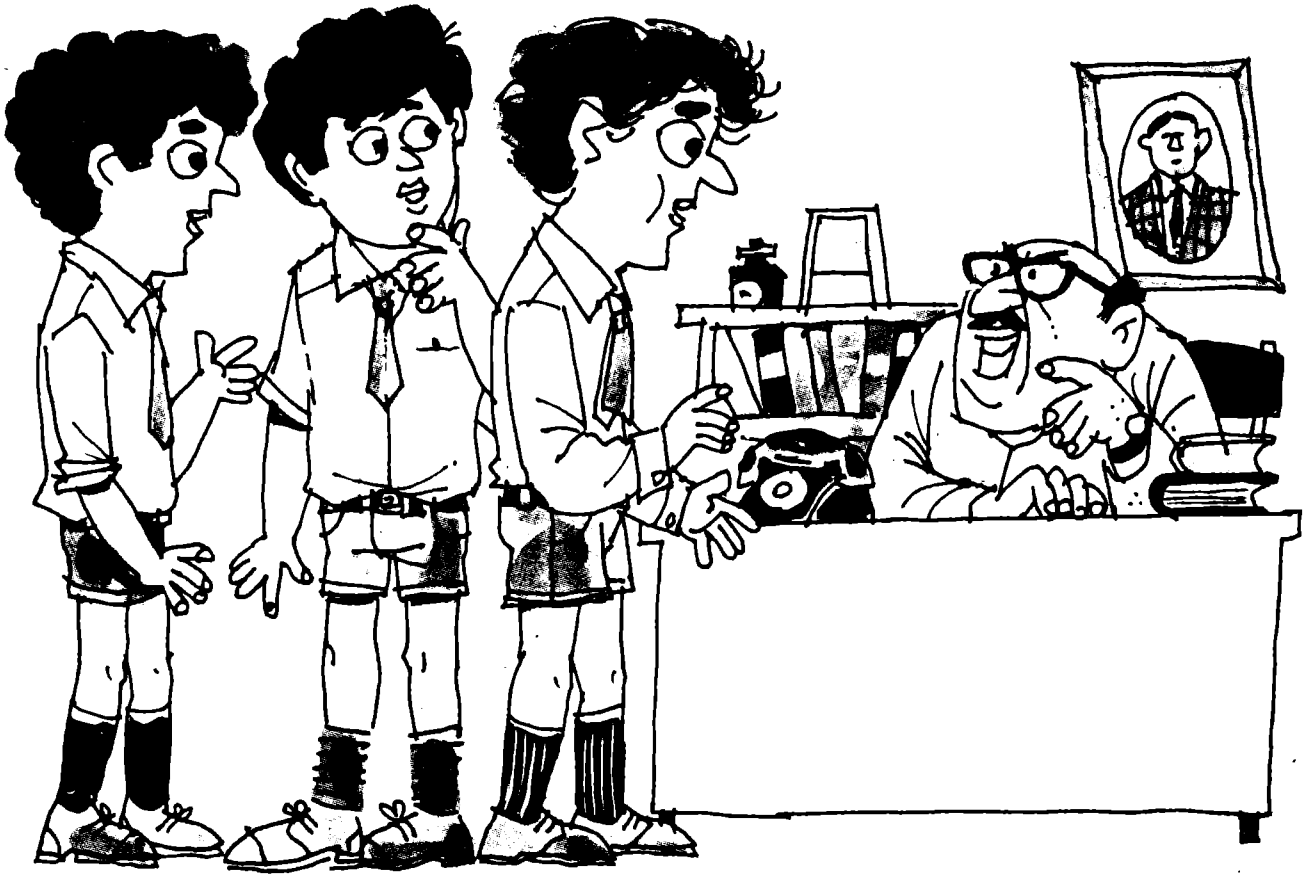

দিয়েছেন। ব্যস, হাসি থেমে গেল। হেঁড়ে গলায় বললুম, "সে উপহারে আমার প্রয়োজন নেই, মহারাজের মাথার মুকুট আমাকে দিতে হবে।" উতরে গেল। আর খুব অল্প বাকি ছিল তৃতীয় দৃশ্যের ; শিবাজি পুরোটাই তলোয়ারের খাপ দেখে দেখে চালিয়ে গেল। তৃতীয় দৃশ্যের শেষে বাংলাস্যার পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেলেন। খুব ভাল হয়েছে। নাটক চলছে। প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে সবাই সবাইকে বলছি, দারুণ হচ্ছে। খুব একটা খারাপ হচ্ছিল না।

কথায় আছে, যার শেষ ভাল তার সব ভাল। আমাদের শেষ দৃশ্য শুরু হল। কর্ণফুলির তীর। তরুতলে জ্যোৎস্নার ক্ষীণাঁলোকে যুবরাজ শুয়ে আছে। যুবরাজ হয়েছে মিলন বেশ ভালই আরম্ভ করল। তারপরেই ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ। ইন্দ্রকুমার ঢুকে পড়ল ঠিক সময়ে। দিব্যেন্দু খুব আবেগ ঢেলে দিয়ে অ্যাক্টিং করছিল, "পরাজয় তোমার হয়নি দাদা, আমারই পরাজয় হয়েছে।" এবার সৈনিকের প্রবেশ করার কথা। সে ঢুকে জানাবে, "কুমার রাজধর যুবরাজের পদধূলি নেবার জন্যে প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়েছেন।"

নিরুপম হয়েছে সৈনিক। ও সবার তদারকিতে এমন ব্যস্ত ছিল যে, ওর খেয়ালই নেই এখন স্টেজে ঢুকতে হবে। মেকাপও হয়নি। শ্যামল নিরুপমকে বলল, "এই নিরু, তোর ঢোকবার সময় হয়েছে।" আমি কিছু বলবার আগেই "ওহো, স্টেজে ঢুকতে হবে" বলেই নিরুপম সটান স্টেজে উঠে পড়ল। ভাবা যায় ? সৈনিক যুবরাজের কাছে খবর দিতে এসেছে, পরনে পায়জামা আর হাতকাটা গেঞ্জি ! তার ওপর নিরুপমের চেহারা তো ল্যাক্‌প্যাকে ! ঐরকম সিরিয়াস দৃশ্যের মধ্যে নিরুপম গিয়ে দাঁড়াতেই দফারফা হয়ে গেল শেষ দৃশ্যের। সবাই হাসতে লাগল। সবাইকে হাসতে দেখে নিরুপম ঘাবড়ে গিয়ে, উবু হয়ে যুবরাজের মুখের কাছে বসে পড়ল। তারপর বুলেটের মতো বলে ফেলল, "কুমার, পদধূলি, রাজধর।"

নাটকের সংলাপ না টেলিগ্রামের ভাষা বোঝা মুশকিল ! মিলন এতক্ষণ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিল, আর পারল না। প্রচণ্ড হাসতে লাগল। হাসির তালে-তালে ওর ভুঁড়ি দুলে-দুলে উঠছে। মারা যাবার দৃশ্যে যুবরাজের এই আকস্মিক হাসিটা দর্শকরা অনেকক্ষণ সহ্য করেছিল, কারণ হাসতে হাসতে হঠাৎ কেঁদে ফেলা আমাদের অনেক বিখ্যাত নাটকের অভিনয়ে দেখা গেছে। কিন্তু হাসি আর থামে না, রেকারিং ডেসিমেলের মতো ফিরে ফিরে আসছে। আর নিরুপম চুপটি করে ওর সামনে উবু হয়ে বসে আছে, এ আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়। আমি লম্বু প্রদীপকে বললাম, "পর্দা টেনে দে।"

ও খুব গম্ভীর মুখ করে উইংসের পাশে গিয়ে মিলনকে বলল, "এই মিলন, একটু কেঁদে ফেল, তাহলেই ম্যানেজ হয়ে যাবে।" মিলন বিষম খেয়ে হেসে উঠল। অগত্যা প্রদীপ পর্দা টেনে দিল।

নাটক শেষ। সবাই মিলে মালপত্তর গোছাচ্ছি। হেডস্যার ঢুকলেন ঘরে। নিরুপম সামনে ছিল।

"এটা কী হল ?" হেডস্যার গম্ভীর গলায় নিরুপমকে জিজ্ঞেস করলেন।

নিরুপমও তেমনি, ডিবেটে ফার্স্ট। খুব সাদামাটা গলায় বলল, "আজ্ঞে, নাটক হল।"

হেডস্যার গটমট করে চলে গেলেন। তারপর থেকেই আমাদের স্কুলে আর নাটক হয় না।

ছবি : দেবাশিস দেব

গাবলু
গাবলু

ফ্ল্যাশ গর্ডন

বিয়ের লগ্নের জন্য অপেক্ষা করছেন সম্রাট মিং। কিন্তু মনে তাঁর অস্বস্তি ...
নগরের বাইরে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে ...
পক্ষী-মানবরা ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ছে ... ফ্ল্যাশের রকেটও এবার নামবে !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বিমল কর এবং ছোটদের কয়েকটি আশ্চর্য বই

বিমল কর কয়েকটি দুধর্ষ বই লিখেছেন তোমাদের জন্য। কোনোটি তুমুল হাসির, কোনোটি দারুণ রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা, কোনোটি আবার কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী। প্রত্যেকটিই অসাধারণ।

যেমন, 'ওআণ্ডারমামা'। জাপান-ফেরৎ এক আজব মামার আজগবি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়ে সে এক হুল্লোড়ময় কাহিনী। আবার ধরো, 'কাপালিকরা এখনও আছে'। দুই কিশোরবন্ধু ও কিকিরা নামের এক আশ্চর্য ম্যাজিশিয়ান কী করে ধরে ফেললেন এ-যুগের এক কাপালিকের নানান গা-ছমছম কাণ্ডকারখানা তাই নিয়েই এই দুর্দান্ত উপন্যাস।

এই ম্যাজিশিয়ান ও তাঁর কিশোরবন্ধুর আরেকটি দারুণ রহস্য – ভেদের কাহিনী 'রাজবাড়ির ছোরা'। এ-বইটার আবার অন্য এক মজা। একই মলাটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছো আরেকটি কল্পবিজ্ঞান কাহিনী—'হারানো জীপের রহস্য'। এটিও এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার।

আবার, 'অলৌকিক' উপন্যাসটির কাহিনী সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের। মানুষের অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে এ-এক ঘুম-কেড়ে-নেওয়া উপন্যাস।

আর এই সেদিন যে-উপন্যাস ছাপা হয়ে বেরুল—'কিশোর ফিরে এসেছিল'—সেটা ? সেটাও নতুন স্বাদের। সবাই যাকে মৃত বলে জানে, সেই মানুষটি কি সত্যি ফিরে আসতে পারে ? এই প্রশ্নেরই জবাব এই উপন্যাসে। এটিও না পড়লেই নয়।

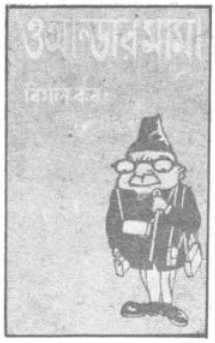

বিমল করের কিশোর সাহিত্য সম্ভার

ওআণ্ডার মামা ১০.০০
কাপালিকরা এখনও আছে ১০.০০
রাজবাড়ির ছোরা
ও হারানো জীপের রহস্য ১২.০০
অলৌকিক ১০.০০
কিশোর ফিরে এসেছিল ১০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

ওলিম্পিকে খেল্ খতম্

অশোক রায়

টিভিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মার্চপাস্টে কোট-প্যান্ট-পরা পাগড়ি-আঁটা ভারতীয়দের দেখতে মন্দ লাগছিল না। ভারতীয়দের দেখতে ভালই লাগে, অন্তত প্রতিযোগিতা শুরুর আগে পর্যন্ত। কারণ সেজে থাকলে দুই স্তরের পার্থক্যটা সহজে চোখে পড়ে না। ভারতীয়দের চেনা শুরু হল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হতেই।

প্রথম থেকেই ব্যর্থতা ভারতের সঙ্গী। শুটিং রেঞ্জ, বক্সিং রিং, ভারোত্তোলনে যখন চক্‌চকে ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটে চলেছে, তখন থেকেই আমরা দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবেই মুছে যেতে আরম্ভ করেছি। এবং তখন থেকেই এক মায়াবী তাড়নায় পিছোতে-পিছোতে হকিকে আঁকড়ে ধরে এক সোনালি স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছি। এককালে আমাদের হকির হাতে সাফল্যের ঘিয়ের গন্ধ ছিল। এখন যার-তার কাছে মাঝে-মাঝেই হেরে যাই, ফলে সেই গন্ধটা আর নেই। তবু ওই হকি নিয়েই আমাদের সোনার স্বপ্ন দানা বেঁধেছিল।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামার আগে পর্যন্ত যথার্থ শক্তিশালী দেশের বিপক্ষে ভারত খেলেনি। প্রথম নাড়া খেল স্পেনের কাছে। ৪—৩ গোলে জয় পেতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল ভারতের। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইদানীং ভারতের ভূমিকা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। তবু ৫ আগস্ট রাত বারোটা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ ছিল নিদ্রাহীন। গত ওলিম্পিকে সোনাজয়ীর কাছে এই প্রত্যাশা ছিলই যে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়াকে ঝাঁঝালো চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাবে ভারত। কিন্তু ৪—২ গোলে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়াই বিরাট ধাক্কা দিল ভারতকে। অধিনায়ক চার্লসওয়ার্থের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া যে প্রচণ্ড গতিময় হকি খেলল তার সঙ্গে কোনো সময়ই তাল রাখতে পারেনি ভারতীয়রা। ১—১ পর্যন্ত ভারত কিছুটা লড়াইয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারপর দুরন্ত ঝট্‌কায় মাত্র চার মিনিটের মধ্যেই পরপর দুটি গোল পেয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ড্রাইভারের সিটের দখল নেয় অস্ট্রেলিয়াই।

গ্রুপের শেষ ম্যাচে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে নিজেকে উজাড় করে দেবার প্রয়োজন ছিল ভারতের। এই ম্যাচে জিততে না পারলে সেমি-ফাইনালে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে দেখা গেল পশ্চিম জার্মানির 'ডি' এলাকায় নবমী পুজোর ভিড়ে পথ হারিয়ে ভারতীয় ফরোয়ার্ড-লাইন গোলের মুখ খুঁজে পেল না। উপস্থিত-বুদ্ধির অভাবে ব্যর্থ হল ছ-ছ'টা পেনাল্টি কর্নার। এবং যে ব্যস্ততায় শেষ মুহূর্তে ভারত অধিনায়ক জাফর ইকবাল সহজতম সুযোগটি হেলায় উড়িয়ে দিলেন তাতে এই সন্দেহ প্রবল হল যে, তাঁর মার্কেটিং সেরে নেবার তাড়া রয়েছে। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে-সঙ্গে টিভিতে চোখ আঁটা আমাদের রাত-জাগা ক্লান্ত শরীরগুলো আবার ফিরে গেল বিছানায়। এবং বালিশে মাথা রেখে দু'চোখ বন্ধ করার আগে মনে হল ভারতকে উপড়ে ফেলার মতো শক্তিশালী হকি দেশগুলো ভাগ্যিস মস্কো ওলিম্পিকে হাজির ছিল না। মাস-দুয়েক অ্যাস্ট্রো-টার্ফে অনুশীলন করে এবং পনেরো দিন আগে লস্ অ্যাঞ্জেলিসে গিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়েও

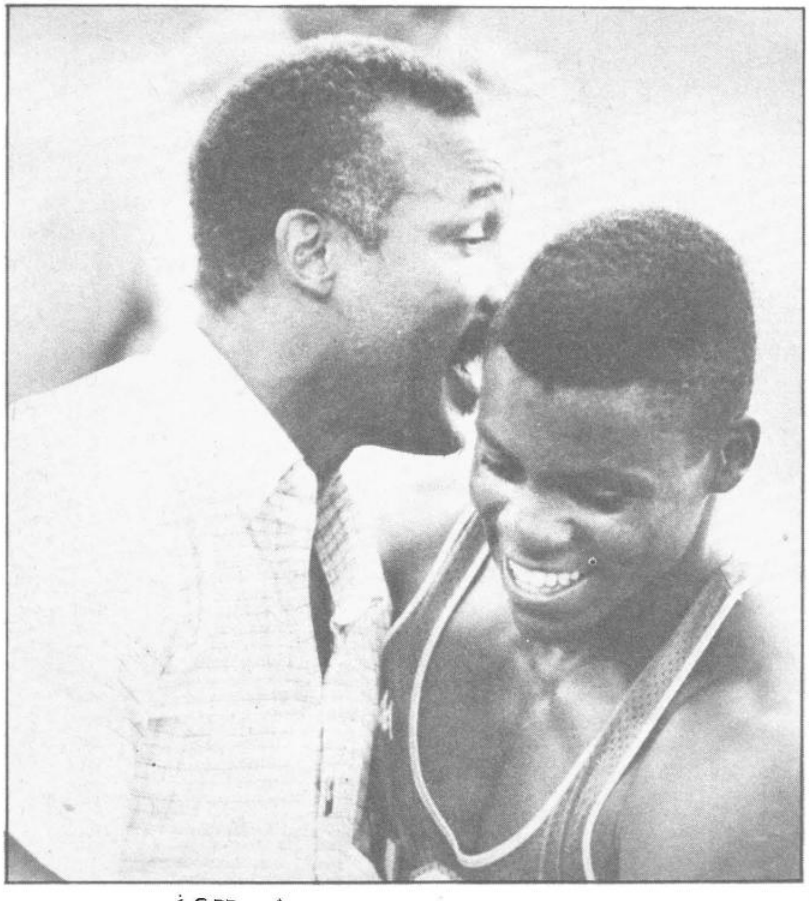

পদক-জয়ের পর কার্ল লিউইস তাঁর বাবার কাছে আদর খাচ্ছেন

সুখে দুঃখে ওলিম্পিক

সম্রাট রায়

ভারত যা পারল না, পাকিস্তান কিন্তু সহজেই সেই কাজটা করে ফেলল। অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়ে হকির সোনা তুলে নিল পাকিস্তান।

অস্তে গেল ভারতীয় হকি। এবং ঠিক আধঘণ্টা পরে উষার উদয় হল ট্র্যাকে। আশ্চর্য সময় করে প্রথম ভারতীয় মেয়ে হিসেবে চারশো মিটার হার্ডল্‌সের ফাইনালে উঠলেন পি টি উষা। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের নিরুপায় চাহিদা হকি ছেড়ে উষার অনুগামী হয়ে পড়ল। চারপাশের জমাট অন্ধকারের মধ্যে গোটা ভারত সেই মুহূর্তে আকুলভাবে পেতে চাইল উষার মাধ্যমে একটুখানি আলো। কিন্তু আমাদের খুশি হবার সামান্যতম চাহিদাটুকুও মরীচিকা হয়েই রয়ে গেল। এক অসাধারণ সংগ্রামের পরে উষা চতুর্থ হয়ে গেলেন। উষাকে মধ্যাহ্নে দেখা হল না। ১৯৬০ রোম ওলিম্পিকে ঠিক এইভাবে দুর্দান্ত দৌড়েও চতুর্থ হয়েছিলেন 'উড়ন্ত শিখ' মিলখা সিং। সেও ছিল এক বিষণ্ণ দিন। কিন্তু সেবার হকিতে দ্বিতীয় স্থান নিয়ে ভারত সেই দুঃখ রুপোলি হাসি দিয়ে সহনীয় করে নিতে পেরেছিল। কিন্তু এবার উষার দুঃখে সান্ত্বনা পাবার মতো কিছুই রইল না ভারতের। এক সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় সমস্ত ভারতবাসীর পদক-জয়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষাকে ঠেলে দিল যন্ত্রণায়।

উষার পরে ভারতবাসীর অবসন্নতা কাটাতে কটা দিন কুস্তিগিররা নানারকম কসরত দেখালেন। রাজিন্দার, রোটাস, কর্তার এবং মহাবীররা বীর-বিক্রমে কিছুদূর এগোলেন। কিছুদূরই। তারপর যথারীতি পদক-প্রাপ্তির ঠিক আগের মুহূর্তে সকলেই কুপোকাত হয়ে ওলিম্পিকে পরাজিত হওয়ার দীর্ঘ অভ্যাস এবং ঐতিহ্য পালন করলেন একে একে। ৪×৪০০ মিটার রিলেতে ফাইনালে উঠেও ভারতের মেয়েরা ব্যর্থতাকেই বরণ করে নিলেন।

সুতরাং খেল্ খতম্। ভারতবর্ষের সত্তর কোটি মানুষের সব স্বপ্ন সঙ্কুচিত হতে হতে শূন্যে মিলিয়ে গেল অবশেষে। সোনা নয়, রুপো নয়, ব্রোঞ্জ নয়, ওলিম্পিয়ানরা দেশে ফিরলেন শূন্য হাতে।

প্রায় প্রতিদিনই ছেলেটা বাড়ি ফিরত লুকিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে। কিন্তু সেদিন একেবারে বাবার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "কী ব্যাপার, কাঁদছ কেন ?"

"আমি আজকেও হেরে গেছি বাবা। আর আমি মাঠে যাব না।" কাঁদতে কাঁদতেই ছেলেটি কোনোমতে বলল কথা কটা।

বাবা একটু হাসলেন। বললেন, "এক কাজ করো, এবার থেকে জিততে শুরু করে দাও। তাহলে তোমাকে আর হারতে হবে না।"

বাবার ওই একটা কথাই জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দিল ছেলেটির। শুরু হল তিলে-তিলে নিজেকে তৈরি করার অমানুষিক চেষ্টা। এবং সেই নিষ্ঠাই ছেলেটিকে লস্ অ্যাঞ্জেলিসে এনে দিল সব-সেরা অ্যাথলিটের সম্মান। ওলিম্পিকে চার-চারটি সোনা জিতল ছেলেটি। সে দিনের সেই ছেলেটিই কার্ল লিউইস। ১৯৩৬ বার্লিন ওলিম্পিকে জেসি ওয়েন্স একই সঙ্গে ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪×১০০ মিটার রিলে এবং লংজাম্পে সোনা জিতে এক বিরাট কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। লস্ অ্যাঞ্জেলিসে কার্ল লিউইস ঠিক ওই ইভেণ্টগুলো জিতেই ওয়েন্স-নামের ইতিহাসকে স্পর্শ

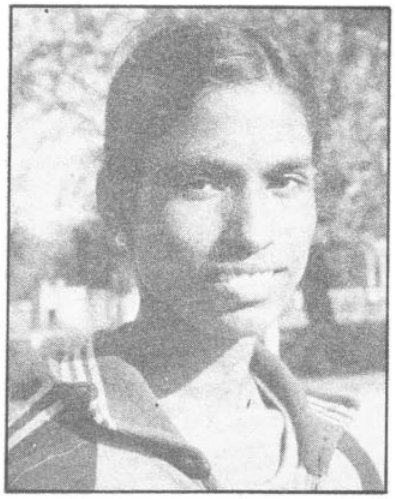

ভারতের উষা

করলেন। শুধু চারটি সোনাই নয়, ৯·৯৯ সেকেণ্ডে শত মিটার দৌড়ে এবারের ওলিম্পিকে 'দ্রুততম মানুষ' হিসেবে চিহ্নিত হলেন আমেরিকার কার্ল লিউইস।

আমেরিকারই আরেক অ্যাথলিট এড্‌ইন মোজেস চারশো মিটার হার্ডলসে সোনা জিতেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যাপার উপর্যুপরি ১০৫টি দৌড়ে তিনি রইলেন অপরাজিত। অ্যাথলেটিকসের ইতিহাসে এমন একটানা জয়ের রেকর্ড আর কারুর নেই। গ্রেট ব্রিটেনের সিবাস্টিয়ান কো মস্কোয় সোনা জিতেছিলেন ১৫০০ মিটারে। এবারেও জিতলেন ওলিম্পিক রেকর্ড গড়ে। গতবার ব্রিটেন গেমস বয়কট করায় কো মস্কোয় গিয়েছিলেন এককভাবে। তাই সেবার কো'র জয়ে উত্তোলিত হয়নি জাতীয় পতাকা, বাজেনি 'গড্ সেভ্ দি কিং'। এবার কো'র সেই দুঃখ মিটল।

সাঁতারের পুলে এবং জিম্‌নাস্টিকসের আসরে আলোড়ন তুলেছেন যথাক্রমে পশ্চিম জার্মানির মাইকেল গ্রস এবং রুমানিয়ার একাতেরিনা জাবো। আমেরিকানদের একচেটিয়া প্রাধান্যের বিরুদ্ধে জলে একাই লড়াই করলেন গ্রস,

দুটি বিশ্বরেকর্ডসহ তিনটি পদক জিতে। এবং মেয়েদের জিমনাস্টিকসে রুমানিয়াকে দলগত সোনাটি এনে দিতে বারে বিমে ম্যাজিক দেখালেন কিশোরী জাবো।

লস্ অ্যাঞ্জেলিসে এবার সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটেছে ১৫০০ মিটার এবং ৩০০০ মিটারে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান আমেরিকার মেরি ডেকারের ভাগ্যে। তিন হাজার মিটার দৌড়ের সময় ডেকারের পাশাপাশি ছুটছিলেন ব্রিটেনের জোলা বাড্। হঠাৎই জোলার পায়ে বেধে পড়ে যান ডেকার এবং ছিটকে যান প্রতিযোগিতা থেকে। ১৯৭২ মিউনিকে সোনা জেতার পক্ষে ডেকার ছিলেন খুবই অল্পবয়সী। '৭৬ মন্ট্রিয়লে আঘাতের কারণে এবং '৮০ মস্কোয় আমেরিকান বয়কটের ফলে ডেকার গেমসে অংশ নিতেই পারেননি। এবার ওলিম্পিকের সোনা জেতার স্বপ্ন মরীচিকা হয়েই রয়ে গেল।

এবারের ২৩তম ওলিম্পিকে আমেরিকানদেরই জয়-জয়কার। সর্বাধিক স্বর্ণ এবং মোট পদক জয়ের সুবাদে আমেরিকা ১৪১ দেশের মধ্যে এক নম্বর আসনটি দখল করেছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে রুমানিয়া এবং পশ্চিম জার্মানি। এশিয়ান কান্ট্রি হিসেবে চিন আমাদের মুখ রক্ষা করেছে চতুর্থ হয়ে। প্রায় পঞ্চাশ জনের ভারতীয় দল ফিরে এসেছে একটি পদকও না পেয়ে।

মেরি ডেকার

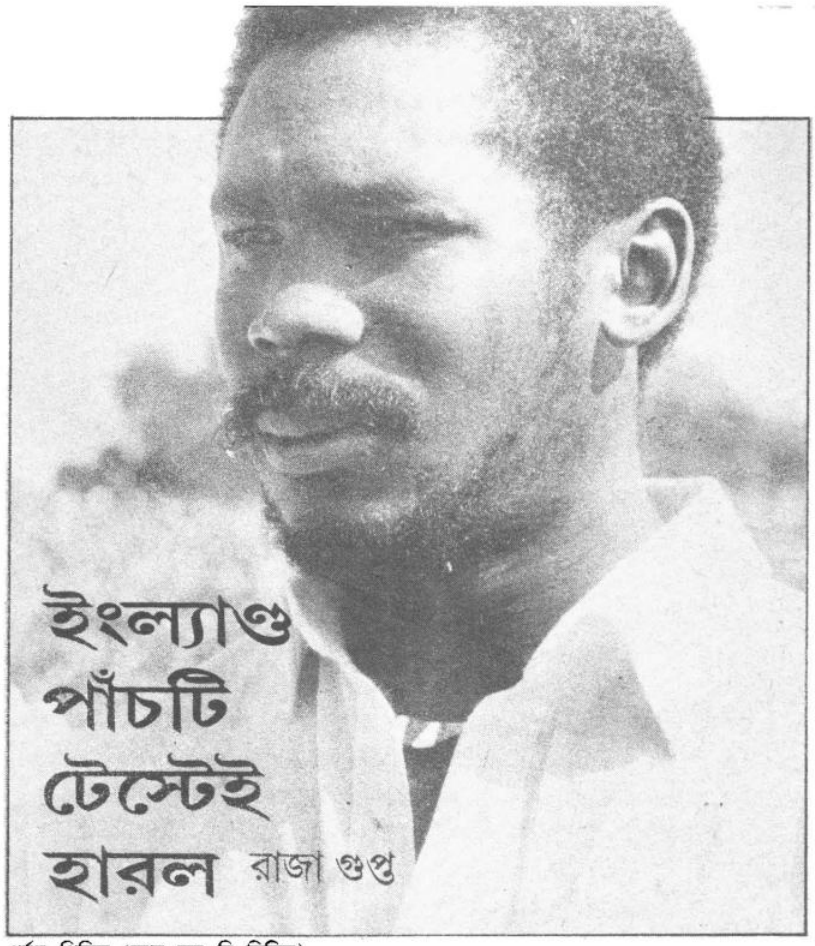

ইংল্যাণ্ড পাঁচটি টেস্টেই হারল

রাজা গুপ্ত

গর্ডন গ্রিনিজ (ম্যান অব দি সিরিজ)

ইংরেজদের লাল মুখ এখন লজ্জায় আরও লাল। দেশের মাটিতে চেনা-চেনা মুখের সামনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কালো মানুষগুলোর হাতে বেদম পিটুনি খেয়ে এই প্রথম ০—৫ মার্জিনে সিরিজ হারল ইংল্যাণ্ড। যেভাবে ইংল্যাণ্ডকে নিয়ে সব কটি ম্যাচেই ছেলেখেলা করল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, তাতে মনে হচ্ছিল দশ টেস্টের সিরিজ হলেও ফলাফল দশ-শূন্যই হত।

ইংল্যাণ্ড এর আগে আর্মস্ট্রংয়ের অস্ট্রেলিয়ার কাছে ঠিক এইভাবে চূর্ণ হয়েছিল ১৯২০—২১ সালে। কিন্তু দেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের এমন লাঞ্ছনা ইংরেজরা আগে কখনও দেখেনি। দুর্ভাগ্য ডেভিড গাওয়ারের, ক্যাপ্টেনশিপটা শুরুতেই একটু তেতো হয়ে গেল। এখন ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে বিধছে সমালোচকদের চোখা-চোখা বাক্যবাণ। ঠিক এইভাবেই কিছু সমালোচক অধিনায়ক কপিলদেবের বিরুদ্ধে আগুন ছুটিয়েছিলেন ক'দিন আগেই, যখন ভারত পরাজিত হয়েছিল এই দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। আসলে সমালোচনা করার সময় ক'জন আর বুঝতে চান যে, এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা তো বটেই, সম্ভবত সর্বকালের সেরা এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলটির বিরুদ্ধে কোনো বিপক্ষ-অধিনায়কেরই করার বিশেষ কিছুই নেই, একমাত্র শান্তভাবে ফলের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া। এমন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে একজন ডেভিড গাওয়ারের সাধ্য কতটুকু ? মাত্র বাইশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে মার্শাল, হোল্ডিং, গারনার নামক ঝড়কে সেই সব ব্যাটে সামাল দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়, টেক্‌নিকের পুঁজি যার খুবই সীমাবদ্ধ। ইংল্যাণ্ড দলে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্যাটসম্যান বলতে ছিলেন গাওয়ার ও বথাম। বর্তমান সিরিজে গাওয়ার ব্যাটে ব্যর্থ। বথামও আশানুরূপ খেলতে পারেননি। একা অ্যালান ল্যাম ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনটি সেঞ্চুরি করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সর্বোচ্চমানের পেস বোলিংও স্বচ্ছন্দে খেলা যায়, যদি উইকেটে দাঁড়াবার সাহস এবং কৌশলটি জানা থাকে। কিন্তু বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার চেয়ে উইকেটকিপার দুজোঁর গ্লাভসে অথবা স্লিপ-কর্ডনে নিজেকে কোনোমতে তুলে দিয়ে অধিকাংশ ইংরেজ ব্যাটসম্যানই যে প্যাভিলিয়নের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

জানিয়ে স্বস্তি পেয়েছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বল তো নয়, বোমা। মাথার খুলি, চোখের মণি, বুকের পাঁজর, পাকস্থলীতে ছোবল বসাবার জন্যে সর্বদাই ফণা তুলেছে। বিপন্ন ইংরেজরা ফুটওয়ার্কের জড়তা নিয়ে কখনই যে ঠিকভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভয়াবহ পেসঝাপ্টার মুখোমুখি হতে পারেননি, তার প্রমাণ রয়ে গেছে সিরিজে পরিষ্কার ফাইভ-নিল পরাজয়ের লজ্জাজনক ঘটনায়।

দুটি দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল আকাশ-জমিন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টপ্-অর্ডার ব্যাটসম্যানরা উইলিস বথামসহ ইংলিশ বোলিংকে পিগ্‌মির আকারে পরিণত করেন ব্যাটের প্রচণ্ড দাপটে। 'ম্যান্ অব দি সিরিজ' বেছে নেবার ক্ষেত্রে নির্বাচকদের কাজ হাল্‌কা করে দেন গর্ডন গ্রিনিজ দু'দুটি ডবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে। বাঁ-হাতি গোমসের দুটি শতরান এবং একটি অপরাজিত বিরানব্বই ইংলিশ বোলিংয়ের নির্বিষ চেহারাটিকে প্রকট করে। সেই সঙ্গে রিচার্ডস, হেন্‌স এবং দুজোঁ একটি করে টেস্ট সেঞ্চুরি বাড়িয়ে রাখার কাজটি সেরে নেন নিঃশব্দে। বোলিংয়ে মার্শাল যে গতিতে বল করেছেন, তাতে আগামী বেশ কিছুদিন দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াবার সময়ে অনেক ইংরেজ-মা'কেই মার্শালের ভয়াবহতার গল্প বলতে হবে। লয়েডের ঝুলিতে-রাখা পৃথিবীর ক্রিকেট ইতিহাসের দীর্ঘতম অস্ত্র ছ'ফুট আট ইঞ্চির জোয়েল 'বিগ' গারনারও ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে বড় মাপের ভূমিকা পালন করেছেন। কিছু-কিছু স্পেলে অতীতকে মনে করিয়ে দিয়েছেন মাইকেল হোল্ডিং। বিশ্ব ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে এক নম্বরে পৌঁছে দিয়েছে এঁদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টা। লয়েডের নেতৃত্ব শুধু বেছে দিয়েছে যে, এই 'সিম্‌ফনি'তে কে কতটুকু বাজবেন। এই সিরিজেই লয়েড পৌঁছলেন ব্যক্তিগত সাত হাজারের ম্যাজিক ফিগারে।

৫—০ ব্যবধানে ইংল্যাণ্ড সিরিজ হারলেও ইয়ান বথাম চার হাজার রান এবং তিনশো উইকেট সংগ্রহের অসাধারণ রেকর্ড গড়লেন বর্তমান সিরিজেই।

মর্যাদার লড়াইয়ে মহমেডান জয়ী

সুব্রত সিংহ

ইডেনে উপস্থিত প্রায় সত্তর হাজার দর্শকের অনেকেই তখন বসার আসনটি খুঁজে নিতে পারেননি। ওই মুহূর্তেই মোহনবাগানের পেনাল্টি বক্সের বাঁ-প্রান্ত থেকে একটি মাপা ব্যাক-সেণ্টার করলেন সুবীর সরকার। পেনাল্টি বক্সের মাথায় শিকারি বাঘের মতো ওত পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহমেডানের দলনায়ক সাবির আলি। উড়ন্ত বল তাঁর চকিত ভলিতে মোহনবাগানের জালে জড়াতেই চুরাশির ফুটবল লিগে অপরাজিত থেকে ও একটি গোলও হজম না করে মোহনবাগানের লিগ জয়ের রঙিন স্বপ্নটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে মহমেডানও অক্ষুণ্ণ রাখল তাদের এই মরসুমে অজেয় থাকার গৌরব।

গোল খেয়ে খ্যাপা পাগলের পরশপাথর খোঁজার মতো মোহনবাগান গোলের খোঁজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহমেডান শিবিরে। মুহুর্মুহু আক্রমণে মহমেডান রক্ষণভাগ বিধ্বস্ত হলেও তাদের শেষ দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য। সেদিন দক্ষতার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন মহমেডানের গোলরক্ষক অতনু ভট্টাচার্য। অন্তত গোটা চারেক অবধারিত গোল থেকে মোহনবাগানকে সেদিন তিনি বঞ্চিত করেন।

মরসুমে তৃতীয় প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগানের এই পরাজয় তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথ থেকে দূরে সরাতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু এই পরাজয়ে তাদের কিছুটা পদস্খলন হয়েছে অবশ্যই। কম্পটনের একটি ছোট্ট অথচ মারাত্মক ভুল, সুবীরের মাপা সেণ্টার ও পরিশেষে সাবিরের চমকপ্রদ ভলিতে গোল, মোহনবাগানকে একটি দুর্লভ নজির সৃষ্টি করার গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে।

সাবির আলি (অধিনায়কের গোলে মহমেডানের জয়)

ঘামাচির কষ্ট থেকে আরাম পেতে ট্যালকম পাউডার নয়, নাইসিল চাই।

নাইসিল লাগান

ঘামাচির কষ্ট থেকে চট্‌পট্‌ আরাম পান।

GLL.8808

২ রকম কৌটোয় পাবেন—'নীল' আর 'চন্দন সুগন্ধে'

নাইসিল হ'ল এক ওষুধ মেশানো পাউডার। ঘামাচির সবরকম কষ্ট থেকে সঙ্গেসঙ্গে আরাম দেওয়ার জন্যেই এটি বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে। এটি চুলকানি, জ্বালাভাব থেকে নিমেষে আরাম দেয় আর ঘামাচি ছড়িয়ে পড়া রোধ করে, যা ট্যালকম পাউডার করতে পারে না।

নাইসিল, ঘামাচির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়ার সবচেয়ে সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য উপায়।

১। অতিরিক্ত ঘাম হওয়া নিবারণ করে। ২। ঘাম শুষে নেয়।
৩। দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু নষ্ট করে। ৪। ত্বকে স্নিগ্ধতা এনে দেয়।

স্বাস্থ্যের উৎস

গ্লাক্সো

এখন!

প্রাকৃতিক গুণে ভরপুর

ভিক্স

হার্বল

বড়ি

এখন ভিক্স-এর নিজস্ব ঔষধি এবং প্রাকৃতিক ভেষজের এমনভাবে সমন্বয়সাধন হয়েছে যে গলার কষ্টে তাড়াতাড়ি আরাম আনে। মুখে আনে এক অনন্য স্বাদ।

গলার পক্ষে উপকারী
স্বাদেও অনন্য!

OBM/1656 BNHR